

দ্বিতীয় অধ্যায়
কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং
Communication Systems and Networking



বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন

এটি মোটেও অতিশয়োক্তি নয় যে বর্তমান পৃথিবীর মানুষ পারিবারিক বন্ধনের মতো একটি বিস্ময়কর মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। একসময় সকলের অগোচরে পৃথিবীর কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মনুষ্যত্বের উপর চরম অবমাননা ঘটে যাওয়া সম্ভব হতো। এখন সেটি আর সম্ভব হয় না। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ এখনো পুরোপুরি ধামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু সেটি কমানো সম্ভব হয়েছে, তার প্রধান কারণ তথ্য প্রযুক্তি। এখন কোনো দেশই বিশ্ব-বিবেকের কাছে জবাবদিহি না করে একটি অন্যায় যুদ্ধ শুরুর করতে পারে না, যুদ্ধ চাঙ্গিয়ে যেতে পারে না। নেটওয়ার্কিংয়ের কারণে পুরো পৃথিবী এখন একটি বড় পরিবারের মতো, এখানে সবাই সবার সাথে যুক্ত হয়ে বসবাস করে। এই নেটওয়ার্কিংকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য একসাথে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হয়েছে। এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের সামনে সেই প্রযুক্তিগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে;
- ভেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ভেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- ভেটা ট্রান্সমিশন মোডের প্রেপিবিন্যাস করতে পারবে;
- ভেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে;
- ভেটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে;
- বিভিন্ন প্রাক্কলের মোবাইল ফোনের ভেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে;
- তথ্য ও বোগাবোধ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে;
- নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- নেটওয়ার্কের পুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- নেটওয়ার্কের টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২.১ কমিউনিকেশন সিস্টেম (Communication System)

২.১.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা (Concept of Communication System)

যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন একটি সহজাত প্রক্রিয়া। শুমু মানুষ নয়, পশু-পাখীরাও নিজেদের মতো করে একটি আরেকটির সাথে যোগাযোগ করে। মানব সভ্যতার উন্মেষের আগে থেকেই নানা ধরনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একজন মানুষ অন্যজনের সাথে নানা পদ্ধতিতে যোগাযোগ করেছে। এজন্য প্রথমে অংগতংগি বা আকার ইংগিত, পরবর্তীকালে নিজেদের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে। সভ্যতার উন্মেষের পর এর ধারাবাহিকতার দূরবর্তী কারো সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যক্তির মাধ্যমে চিঠি পাঠানো এবং পরবর্তীকালে ডাকবিভাগ, ট্রাঙ্ক কল, টেলিগ্রাফ কিংবা টেলিকোনের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। রেডিও, টিভি ইত্যাদিও এক ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া বা মাধ্যম, যার মাধ্যমে একজন উপস্থাপক বা সংবাদ পাঠক অসংখ্য দর্শক-শ্রোতার কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে। এধরনের ভাবের আদান প্রদান বা তথ্য বিনিময়ের জন্য যখন একজন অন্যজনের সাথে যোগাযোগ করে থাকে সেই প্রক্রিয়াটাই কমিউনিকেশন সিস্টেম বা যোগাযোগ পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট, বা মোবাইল ফোনের উদ্ভাবনের পর যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পরিধি আরো ব্যাপক, সুবিশাল এবং সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, এখন শুমু মানুষের সাথে মানুষ নয়, যন্ত্রের সাথে যন্ত্রেরও যোগাযোগ হতে শুরু করেছে।

কাজেই আমরা বলতে পারি কমিউনিকেশন (Communication) বা যোগাযোগ কতকগুলো উপাদানের সুসমন্বয়ে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের একটি প্রক্রিয়া। এটি প্রেরক, প্রাপক, যোগাযোগ-মাধ্যম এবং কিছু ক্ষম্পাতির মাধ্যমে বৌধিক কিংবা অন্য যেকোনো ধরনের তথ্য বা বার্তা আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২.১.২ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা (Concept of Data Communication)

কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ হলো তথ্য আদান প্রদানের জন্য দুটি পরেন্টের মধ্যে সংযোগ বা লিংক স্থাপনের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রেরণকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে নিরাপদ ও সুস্থভাবে ডেটা আদান-প্রদানের একটি ব্যবস্থা। ২.১ চিত্রে একটি ইলেকট্রনিক ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির পঠন দেখানো হয়েছে।



চিত্র ২.১: ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন অংশ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে উৎস হতে শব্দ, প্রতীক, ভবন, ছবি ইত্যাদি একটি মাধ্যম হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে। এ প্রক্রিয়ায় একটি ট্রান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্র এবং একটি রিসিভার বা গ্রাহক যন্ত্র প্রয়োজন হয়। উৎস বা সোর্স হতে প্রাপ্ত ডেটাকে ইনপুট ট্রান্সডিউসারের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সংকেতকে (আলোক সংকেতও হতে পারে) রূপান্তর করে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মিডিয়ামে (তার

বা তারবিহীন) পাঠায়। এরপর মিডিয়াম হতে রিসিভার ইলেকট্রিক সংকেতকে আউটপুট ট্রান্সডিউসারের মাধ্যমে পূরণায় রূপান্তর করে গন্তব্য বা ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দেয়। এখানে প্রাপ্ত ডেটা উৎস ডেটার ন্যায় হয়ে থাকে। উল্লেখ্য থাকে উৎস হতে গন্তব্যে ডেটা প্রেরণের সময় মিডিয়ামে নয়েজ (বিক্ষিপ্তভাবে অপ্রত্যাশিত ইলেকট্রিক সংকেত) যুক্ত হতে পারে যা সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে।

ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর উদাহরণ:

১. উৎস বা সোর্স (তথ্য উৎস ও ইনপুট ট্রান্সডিউসার)- মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, কীবোর্ড ইত্যাদি।
২. ট্রান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্র- বেতার কেন্দ্র, টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, মডেম, রাউটার ইত্যাদি।
৩. মিডিয়াম বা মাধ্যম- টেলিফোন/ফাইবার অপটিক ক্যাবল, রেডিও/মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।
৪. রিসিভার বা গ্রাহক যন্ত্র- টেলিফোন এন্ডচঞ্জ, মডেম, রাউটার ইত্যাদি।
৫. গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন (আউটপুট ট্রান্সডিউসার ও তথ্য গন্তব্য)- লাউড স্পিকার, টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

২.১.৩ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

বর্তমান বিশ্বে আমাদের সবারই কম-বেশি ইন্টারনেট এবং তার গতি বা স্পিড সম্পর্কে একটি ধারণা আছে। এই ‘ইন্টারনেট’ -এর গতি বা স্পিড তার ব্যান্ডউইথের উপর নির্ভরশীল। প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তাকে অর্থাৎ ডেটা স্থানান্তরের হারকে ব্যান্ডউইথ বলে। ব্যান্ডউইথ সাধারণত bit per second (bps) -এ হিসাব করা হয়। তবে ইদানীং নেটওয়ার্কে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায় বলে বিপিএস (bps) -এর পরিবর্তে কেবিপিএস (kbps: প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার বিট) বা এমবিপিএস (Mbps: প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন বিট) এমনকি জিবিপিএস (Gbps: প্রতি সেকেন্ডে এক বিলিয়ন বিট) অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। আট বিটকে এক বাইট বলা হয় বলে এক MBps বলতে আট Mbps বোঝানো হয়।

টেবিল 2.1 : বিভিন্ন সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ

ইমেইল	0.5 Mbps
ওয়েব ব্রাউজিং	0.5 থেকে 1.0 Mbps
স্ট্রিমিং মিউজিক	0.5 Mbps
ফোন কল (VoIP)	0.5 Mbps
স্ট্রিমিং ভিডিও	0.7 Mbps
স্ট্রিমিং মুভি	1.5 Mbps
স্ট্রিমিং HD মুভি	4 Mbps
ভিডিও কনফারেন্সিং	1 Mbps
ভিডিও কনফারেন্সিং HD	4 Mbps
ইন্টারনেত গেম কনসোল	1 Mbps
অনলাইন HD মান্টিপ্লেয়ার গেমিং	4 Mbps

একটি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ সেখানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং মিডিয়ামের উপর নির্ভর করে। যেমন মিডিয়াম হিসেবে সাধারণ টেলিফোনের তার ব্যবহার করলে যত ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়, ফাইবার অপটিক ক্যাবলে তার থেকে অনেক গুণ বেশি পাওয়া যায়। আবার ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাথে যদি যথাযথ স্পীডের টারমিনাল ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা না হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ পাওয়া সম্ভব হয় না।

একটি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক যেহেতু অনেকে ব্যবহার করে তাই নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ সকল ব্যবহারকারীর মাঝে ভাগ হয়ে যায়। অনেক সময় একজন ব্যবহারকারী কিংবা একটি সার্ভিস ব্যান্ডউইথের একটা বড় অংশ দখল করে অন্যদের শেয়ার কমিয়ে দেয়। একটি নেটওয়ার্কে একজন ব্যবহারকারী কতটুকু

প্রকৃত ব্যান্ডউইথ পাচ্ছে সেটি মাপার নানা ধরনের পদ্ধতি রয়েছে, নেটওয়ার্কের ডিজাইনে কিংবা যন্ত্রপাতিতে কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো বের করা সম্ভব। সে কারণে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট বর্তমান সময়ে অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

2.1 টেবিলে বিভিন্ন সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই একজন ব্যবহারকারীর যদি নির্দিষ্ট একটি সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ না থাকে তাহলে তার পক্ষে সেই সার্ভিসটি সঠিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

২.১.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Data Transmission Method)

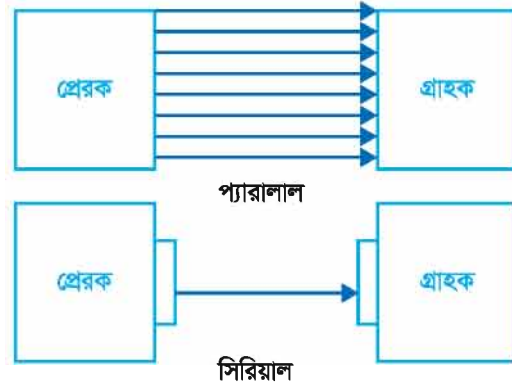
ডেটা কমিউনিকেশনে এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ডেটা বিটের বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলে।

বিটের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডকে প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন এবং সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন এই দুভাবে ভাগ করা হয়েছে। সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশনে একটি মাধ্যম দিয়ে একবারে একটি বিট পাঠানো হয়। প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনে অনেকগুলো মাধ্যম দিয়ে একবারে একসাথে অনেক বিট পাঠানো হয়।

প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন

প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনে একসাথে ডেটা ট্রান্সমিশন করার জন্য অনেক ডেটা লাইনের সাথে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র পরস্পরের সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি বা দুইটি কন্ট্রোল লাইনও থাকে। বিটগুলো ঠিক একই সময়ে একই সাথে স্থানান্তরিত হয়। কম্পিউটারের ভেতরের সার্কিটে যেহেতু ডেটাগুলো প্যারালাল পদ্ধতিতে কাজ করে সেজন্য প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনই তার স্বাভাবিক বিন্যাস। একসাথে অসংখ্য লাইনে ডেটা পাঠানো হয় বলে এটি অনেক দ্রুতগতির ট্রান্সমিশন।

তবে অনেক দূরে ডেটা পাঠাতে হলে এটি বাস্তবসম্মত নয়। দ্রুতগতিসম্পন্ন এই পদ্ধতি অনেক সময় ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, প্যারালাল প্রিন্টার পোর্ট ও ক্যাবল ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের সংযোগ ইত্যাদি এর উদাহরণ।



চিত্র 2.2: প্যারালাল এবং সিরিয়াল ডেটা কমিউনিকেশন

সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন

এই ট্রান্সমিশনে যেকোনো দূরত্বে অবস্থিত প্রেরক এবং গ্রাহকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এক বিটের পর অপর একটি বিট স্থানান্তরিত করা হয়। এটি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি কেননা, এতে পূর্ববর্তী ডেটা বিট প্রেরণের পর অপরটি প্রেরিত হয়। একটি মাত্র তার ব্যবহার হয় বলে যন্ত্রপাতি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সাশ্রয়ী। পাশাপাশি অনেক তার নেই বলে নিজেদের ভেতর নয়জের প্রভাব কম। কম্পিউটার এবং প্রায় সকল ডিভাইসে আজকাল যে ইউএসবি (USB: Universal Serial Bus) পোর্ট দেখা যায় সেটি সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের উদাহরণ।

সিরিয়াল পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের সময় প্রেরক এবং গ্রাহক দুটি ডিভাইসকেই ক্লক ব্যবহার করতে হয় এবং ক্লকের প্রতি পালসে একটি করে বিট প্রেরণ এবং গ্রহণ করা হয়। এই ক্লক ব্যবহার করে বিটের শুরু ও শেষ বোঝার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যাকে বিট সিনক্রোনাইজেশন বলে। বিট সিনক্রোনাইজেশনের কারণেই প্রাপক সিগন্যাল থেকে ডেটা শনাক্ত এবং পুনরুদ্ধার করতে পারে।

বিট সিনক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :



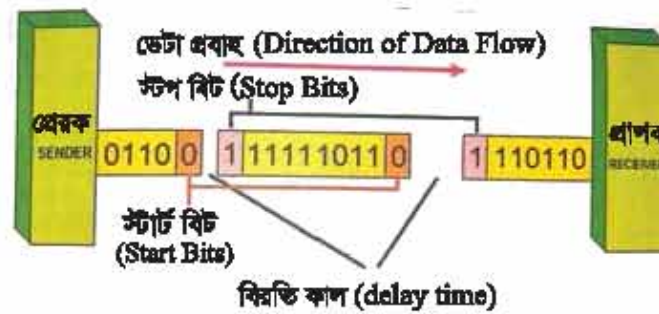
চিত্র 2.3: তিন ধরনের সিরিয়াল ডেটা কমিউনিকেশন

১. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission) ও
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রেরক যখন খুশি তখন ডেটা প্রেরণ করতে পারে, গ্রাহক সবসময়েই সেই ডেটা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। শুধু তাই নয় একবার ডেটা পাঠিয়ে তার পরবর্তী সময় আরেকবার ডেটা পাঠানোর মাঝখানে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ সময় নেয়া যায়। ডেটা পাঠানোর আগে একটি স্টার্ট বিট পাঠানো হয় এবং সেই বিটটি দেখে গ্রাহক যন্ত্র বুঝতে পারে ডেটা আসতে শুরু করেছে এবং তার ঠিক সেই বিটের শুরুর সাথে সমন্বয় করে নেয়। ডেটা পাঠানো শেষ হওয়ার পর একটি বা দুইটি স্টপ বিট পাঠানো হয় এবং সেটি দেখে গ্রাহক যন্ত্র বুঝতে পারে ডেটা পাঠানো শেষ হয়েছে। যখন প্রয়োজন তখন ডেটা প্রেরণ করা যায় বলে এই ক্ষেত্রে গ্রাহকারি স্টোরেজ ডিভাইসের কম্পিউটারে ব্যবহৃত RAM, Cache, or CPU memory ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘ গতিতে অল্প পরিমাণ ডেটা পাঠানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার সুবিধাজনক।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের একটি উদাহরণ হচ্ছে কম্পিউটারের কী-বোর্ড। এখানে একটি কী (Key) চাপার পর পরবর্তী কী চেপে টাইপ করার মধ্যবর্তী সময়সীমা অসম বা অনির্ধারিত হতে বাধ্য। এজন্যই এই ট্রান্সমিশন পদ্ধতির নাম অ্যাসিনক্রোনাস রাখা হয়েছে।



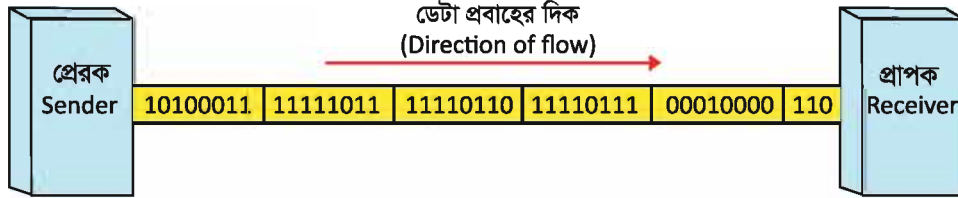
সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনকে বলা যায় বিরতিহীন ডেটা ট্রান্সমিশন। এই পদ্ধতিতে বিরতিহীনভাবে প্রেরক যন্ত্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রে ডেটা পাঠানো হয়। যেহেতু প্রেরিত ডেটা ব্যবহার করে গ্রাহক যন্ত্র তার ঠিককে সমন্বিত

করে তাই প্রেরণ করার জন্য কোনো ডেটা না থাকলেও আইডল সিকোয়েন্স (idle sequence) হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত ডেটা পাঠানো হয়।

সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরক-স্টেশনে প্রথমেই ডেটাকে প্রাইমারি স্টোরেজে (কম্পিউটারে ব্যবহৃত RAM, Cache, or CPU memory ইত্যাদি) সংরক্ষণ করে ডেটার ক্যারেক্টারগুলোকে ব্লক বা ফ্রেম আকারে ভাগ করে নেয়। প্রতিবার একটি করে ব্লক বা ফ্রেম ক্লকের সাথে সমন্বয় করে সমান বিরতি দিয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি ব্লক-ডেটার শুরুতে 1 বা 2 বাইটের একটি হেডার ইনফরমেশন এবং ব্লক-ডেটার শেষে একই পরিমাপের একটি ট্রেইলার ইনফরমেশন সিগন্যাল পাঠানো হয় এবং বিশাল নেটওয়ার্কে গন্তব্য খুঁজে বের করার জন্য এর মাঝে সাধারণত প্রেরক ও গ্রাহককে চিহ্নিতকরণের সংখ্যা বা অ্যাড্রেস দেয়া থাকে। গ্রাহক যন্ত্র এই হেডার সিগন্যাল ব্যবহার করে প্রেরকের ব্লক-স্পীডের সাথে সিনক্রোনাইজ বা সমন্বিত করে। ট্রেইলার ব্লকের শেষ নির্দেশ করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্লকের ভেতরকার ভুল নির্ণয় এবং সংশোধনে সহায়তা করে।

প্রযুক্তিগতভাবে এ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল এবং ব্যয়বহুল হলেও বেশি ব্যান্ডউইথের ডেটা দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাই বড় ধরনের নেটওয়ার্কসহ মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক, টি.ভি. নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য।



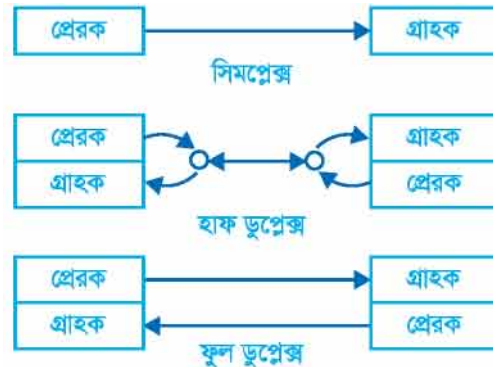
আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস -এর একটি মিশ্র পদ্ধতি হচ্ছে আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন। এ প্রক্রিয়ায় অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতির স্টার্ট ও স্টপ বিটের মাঝখানে সিনক্রোনাস পদ্ধতিতে ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সফার করা হয়। যেহেতু পুরোটা সিনক্রোনাস নয়, তাই স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করেই যখন প্রয়োজন তখন সেই ডেটা ট্রান্সমিট করা যায়। সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনে এর প্রচলন বেশি। বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন যেমন, অডিও বা ভিডিও কল -এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে।

২.১.৫ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশককে ডেটা ট্রান্সমিশন বা ডেটা কমিউনিকেশন মোড বলে। ডেটা প্রবাহের দিক -এর উপর নির্ভর করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

সিমপ্লেক্স মোড (Simplex mode) : এই পদ্ধতিতে শুধু একদিকে ডেটা পাঠানো সম্ভব হয়, প্রেরক শুধু ডেটা প্রেরণ করে এবং গ্রাহক শুধু ডেটা গ্রহণ করে। কী বোর্ড, মাউস, পেজার সিমপ্লেক্স মোডের উদাহরণ।



চিত্র ২.৪: সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স এবং ফুল ডুপ্লেক্স

হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-duplex mode) : এই পদ্ধতিতে দুইদিকেই ডেটা পাঠানো বা গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু একসাথে নয়, আলাদা আলাদাভাবে। একটি ডিভাইস ডেটা পাঠালে অন্যটিকে অপেক্ষা করতে হয় তার সুযোগ আসার জন্য। এই পদ্ধতিতে ডেটার ভেতর সংঘর্ষ (collision) না হওয়ার জন্য বিশেষ সার্কিটের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ওয়াকিটকি, ফ্যাক্স, এস.এম.এস ইত্যাদি হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে চলে।

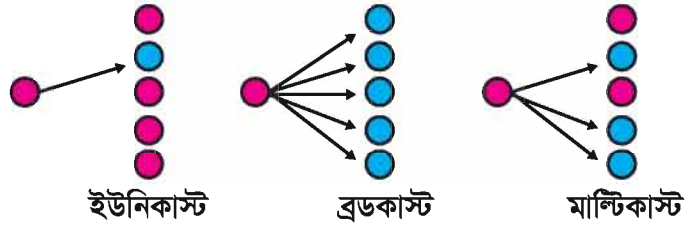
ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-duplex mode) : ফুল-ডুপ্লেক্স মোডে একই সময়ে উভয় প্রান্তের দুটি ডিভাইস একই সাথে ডেটা প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে পারে। টেলিফোন, মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন এই পদ্ধতির উদাহরণ।

ডেটা বিতরণ বা ডেলিভারি মোড (Data distribution mode)

প্রাপকের সংখ্যা ও ডেটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ডেটা বিতরণ বা ডেলিভারি মোড ভিন্ন ভিন্ন মোডে হতে পারে। যেমন :

ইউনিকাস্ট (Unicast mode) :

এই ব্যবস্থায় একটি প্রেরকের কাছ থেকে শুধু একটি গ্রাহকই ডেটা গ্রহণ করতে পারবে। ইউনিকাস্ট মোড সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স হতে পারে। পেজার, ফ্যাক্স, মোবাইল, টেলিফোন, খেলনা, ওয়াকিটকি, সিজেল এস.এম.এস ইত্যাদি ইউনিকাস্ট মোডের উদাহরণ।



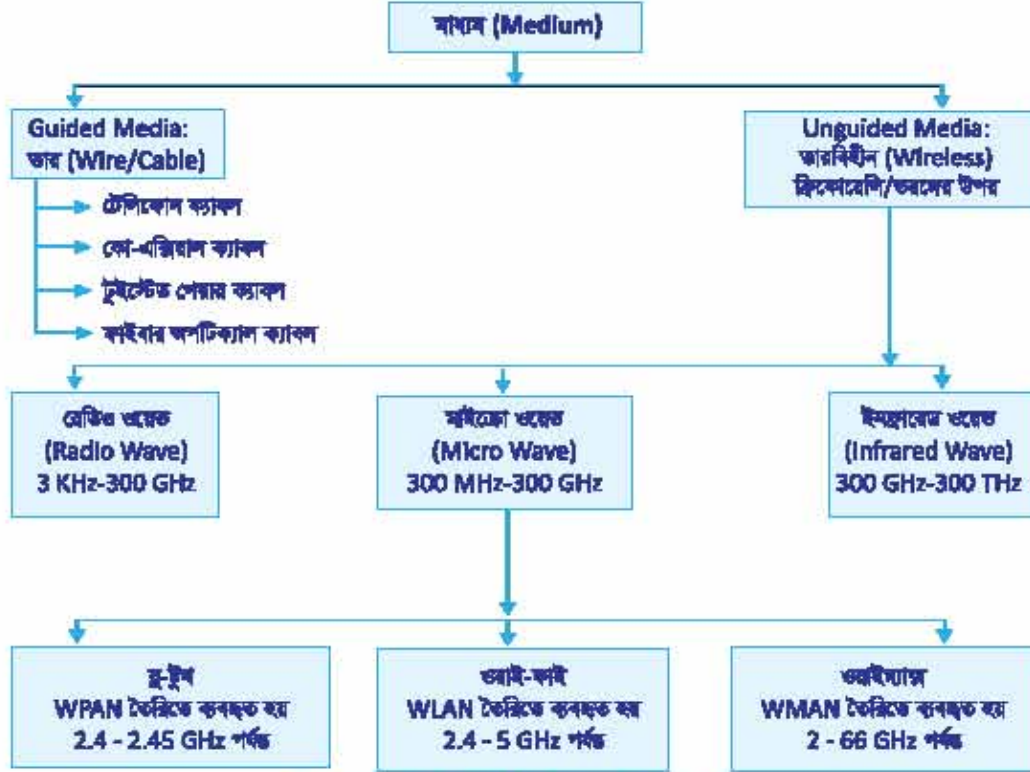
চিত্র 2.5: ইউনিকাস্ট, ব্রডকাস্ট এবং মাল্টিকাস্ট

ব্রডকাস্ট (Broadcast mode) : এ পদ্ধতিতে শুধু একজন প্রেরক থাকে, কিন্তু ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের আওতাধীন সব গ্রাহকই ডেটা গ্রহণ করতে পারে। ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন শুধু সিমপ্লেক্স হয়ে থাকে। রেডিও, টেলিভিশন ব্রডকাস্ট মোডের উদাহরণ।

মাল্টিকাস্ট (Multicast mode) : মাল্টিকাস্ট মোড অনেকটা ব্রডকাস্ট মোডের মতো হলেও এই মোডে নেটওয়ার্কের একটি প্রেরক হতে ডেটা প্রেরণ করলে তা শুধু অনুমোদিত সদস্যরা গ্রহণ করতে পারে। মাল্টিকাস্ট ট্রান্সমিশন হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স-এ হয়ে থাকে। ভিডিও কনফারেন্সিং, চ্যাটিং, গ্রুপ SMS ইত্যাদি মাল্টিকাস্ট মোডের উদাহরণ।

২.২ ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Medium of Data Communication)

ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত যে সব সংযোগ স্থাপন করা হয় তাদেরকে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বা চ্যানেল বলা হয়। অথবা উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যার মধ্য দিয়ে তথ্য প্রবাহিত হয় তা-ই ডেটা কমিউনিকেশন চ্যানেল বা মাধ্যম। এই চ্যানেল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম বা মিডিয়া থাকে। রেডিও, টি.ভি, ডিশ চ্যানেল ইত্যাদি গ্রাহক পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য তারযুক্ত বা তারবিহীন যে সংযোগ প্রদান করা হয়, তা হলো মাধ্যম বা মিডিয়া। ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাধ্যম 2.6 চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।



চিত্র 2.6: ডেটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যম

২.২.১ তার মাধ্যম (Wired Media)

এ পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে খাঁড়ব তার ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট কোনো পথে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানোর জন্য মাধ্যম হিসেবে কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তার বা ক্যাবল ব্যবহার করে ডেটা কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এটি ক্যাবল গাইডেড মিডিয়া। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহারের ভিন্নতার উপর তার বা ক্যাবলের ভিন্নতা রয়েছে, নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted pair cable)

দুটি পরিবাহী তারকে পরস্পর সুবিন্যাসে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুধরনের হয়ে থাকে, অনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (UTP: Unshielded Twisted Pair) এবং শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (STP: Shielded Twisted Pair)।



চিত্র 2.7: অনশিল্ডেড এবং শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

সাধারণ কপার নির্মিত এ সব ক্যাবলে মোট চার জোড়া তার প্রতিটি পৃথক অপরিবাহী পদার্থের আবরণে (ইন্সুলেটর) আবৃত থাকে। প্রতি জোড়া তারে একটি কমন রঙের (সাদা রঙের) আরেকটি ভিন্ন রঙের (যেমন : নীল, সবুজ, কমলা ও বাদামি) তারের সাথে পাঁচানো থাকে। প্রতি জোড়া তার পৃথক অপরিবাহী আবরণে আবৃত করা থাকে। এ ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করে 100 মিটারের বেশি দূরত্বে কোনো ডেটা প্রেরণ করা যায় না। ক্যাটাগরির ভিত্তিতে এর ব্যান্ডউইথ 10 Mbps থেকে 1 Gbps পর্যন্ত হতে পারে, তবে দূরত্ব বাড়তে থাকলে ডেটা ট্রান্সকার রেট কমতে থাকে। বাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে টুইন্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial Cable)

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল তামা বা কপার নির্মিত মূলত তিনটি স্তর বিশিষ্ট তারের ক্যাবল, কেন্দ্রস্থলে একটি শক্ত তামার তারের কন্ডাক্টর, সেটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে প্লাস্টিকের অপরিবাহী স্তর এবং এই স্তরকে ঘিরে তামার তারের একটি জাল বা শিল্ড (Braided Shield)। অনেক সময় শিল্ড এবং প্লাস্টিক অপরিবাহী স্তরের মাঝে একটি মেটালিক ফয়েলও থাকে। সবশেষে রাবারের অপরিবাহী পুরু স্তর এই ক্যাবলটিকে আবৃত করে রাখে। তামার তারের জালি এবং মেটালিক ফয়েলটি একসাথে আউটার কন্ডাক্টর (Outer conductor) হিসেবে বাইরের সকল প্রকার বৈদ্যুতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে। বাইরের শিল্ড এবং কেন্দ্রীয় তামার তারের অক্ষ (axis) একই থাকার দরুন এর নামকরণ কো-এক্সিয়াল করা হয়েছে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলে ডেটা ট্রান্সকার রেট টুইন্টেড পেয়ার ক্যাবলের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সমিশন লস্ অর্পেকাকৃত কম এবং সহজে বায়বায়নযোগ্য। ডিজিটাল এবং এনালগ উভয় ধরনের ডেটা এই ক্যাবলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়। ক্যাবল টি.ভি. নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দু'ধরনের হয়- থিননেট (Thinnet) এবং থিকনেট (Thicknet)।

থিননেট (Thinnet) : থিননেট হালকা ও নমনীয় তার। এই তার 10BASE-2 নামেও পরিচিত। এ ক্যাবলটি দ্বারা রিলিটার (দূর্বল সংকেতকে শক্তিশালী সংকেতে বিবর্ধিত (Amplify) করা) ছাড়া সর্বোচ্চ 185 মিটার দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে 10 মেগাবাইট ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।

থিকনেট (Thicknet) : থিকনেট ভারী ও নন-ফ্লেক্সিবল ক্যাবল। এই তার 10BASE-5 নামেও পরিচিত। এ ক্যাবলটি দ্বারা সর্বোচ্চ 500 মিটার দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে 10 মেগাবাইট ডেটা সহজেই আদান-প্রদান করা যায়।



চিত্র 2.8: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

ফাইবার অপটিক ক্যাবল বিশেষভাবে পরিপূর্ণ কাচের তৈরি অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তু, যদিও বিশেষায়িত কাজের জন্য প্লাস্টিক বা অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের তৈরি ফাইবার অপটিক ক্যাবলও পাওয়া যায়। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ইনফ্রারেড আলোর একটি রেঞ্জের ভেতর (1300-

1500nm) অবিস্ফাস্য নকম স্বচ্ছ, তাই শোষণের কারণে বিশেষ কোনো লস ছাড়াই এর ভেতর দিয়ে সিগন্যাল দীর্ঘ দূরত্বে নেয়া যায়।

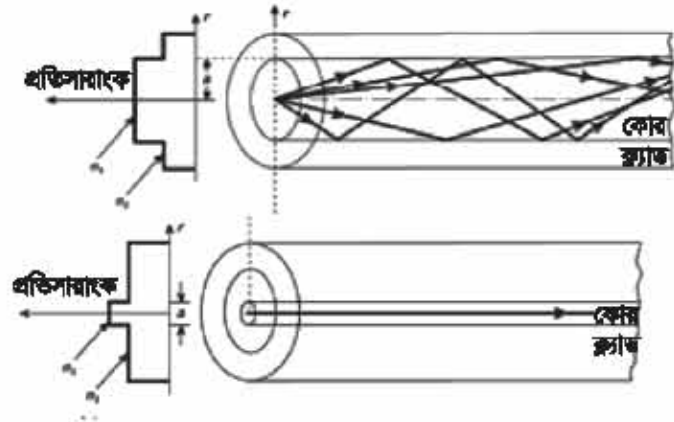


চিত্র ২.৯: অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কেন্দ্রের অংশটুকুর প্রতিসরাংক বাইরের অংশের প্রতিসরাংক থেকে বেশি। যে অংশের প্রতিসরাংক বেশি তাকে কোর (Core) বলে, এবং যে অংশের প্রতিসরাংক কম তাকে ক্ল্যাড (Clad) বলে। প্রতিসরাংকের পার্থক্যের কারণে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে কোনো লস ছাড়াই কোরের ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারে। (তবে কোরের ভেতর আলো আটকে থাকার প্রক্রিয়াটি সাধারণ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন থেকে ভিন্ন প্রকৃতির) ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত ক্যাবলের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল বলে এটি তৈরি করার সময়েই পাতলা প্লাস্টিকের আবরণে

আবৃত্ত করে ফেলা হয়। ব্যবহারের আগে কেডলারের আলি এবং পলিমারের (চিত্র ২.৯) আবরণে ঢেকে নেয়া হয়। ক্যাবল তৈরি করার সময় বেশ কয়েকটি ফাইবারকে একত্র করে পলিমারের আবরণে ঢেকে নেয়া হয়। ফাইবার বীকা করলে সেখানে লস হতে পারে বলে ক্যাবলের ভেতর একটি সরু ধাতব রড ঢুকিয়ে রাখা হয়।

সিঙ্গেল মোড এবং মাল্টি মোড ফাইবার : অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যাস ১৫০ মাইক্রনের মতো হয়। ফাইবারের কোরের ব্যাস ৮ থেকে শুরু করে ১০০ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র ২.১০)। কোরের ব্যাস যখন ৮ থেকে ১২ মাইক্রন হয় তখন সেটিকে সিঙ্গেল মোড ফাইবার বলে, কারণ তখন শুধু একটি মোড ফাইবারের কেন্দ্র দিয়ে যেতে পারে। দূরপাল্লার হাই স্পিড ট্রান্সমিশনে সব সময় সিঙ্গেল মোড ফাইবার ব্যবহার করা হয়। কোরের ব্যাস অত্যন্ত কম হওয়ায় এই ফাইবারের প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে ব্যয়সাধ্য।

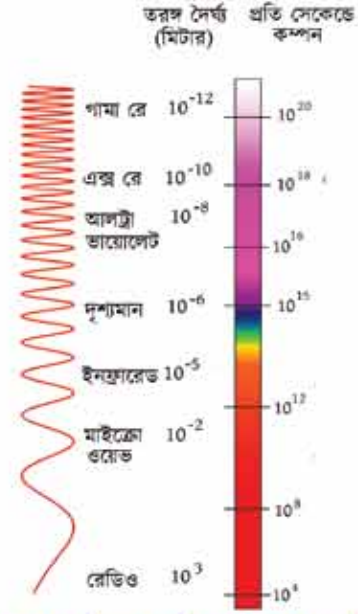


চিত্র ২.১০: মাল্টি মোড এবং সিঙ্গেল মোড ফাইবার

ফাইবারের কোরের ব্যাস যদি ৫০ থেকে ১০০ মাইক্রনের মতো হয় তখন তার ভেতর অসংখ্য মোড যেতে পারে, একেকটি মোড একেকভাবে যায় বলে আলোর সিগন্যালে বিকৃতি হয় বলে এই ফাইবার শুধু স্বল্প দূরত্বে কম স্পিডের কাজে ব্যবহার হয়। কোরের ব্যাস বেশি বলে প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং মূল্য সাপ্তয়ী।

লেকচার : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সত্যিকার অর্থে কাজ করার জন্য 1300 nm থেকে 1500 nm লেকচার উদ্ভাবনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এলইডি (LED)-এর আলোতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ফাইবারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বিকিরণের (Dispersion) কারণে সিগন্যালের বিচ্যুতি ঘটে, সেজন্য এটি দীর্ঘ দূরত্বে ব্যবহার করা যায় না। লেকচারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট বলে এটি দূরপাল্লার কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা যায়।

যদিও 1300 nm এবং 1500 nm এই দুই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন করা সম্ভব কিন্তু 1500 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য ফাইবার অস্ট্রিকায়ার উদ্ভাবনের কারণে দূরপাল্লার কমিউনিকেশনে বর্তমানে প্রায় একচেটিয়াভাবে 1500 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র 2.11: বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের স্পেকট্রাম

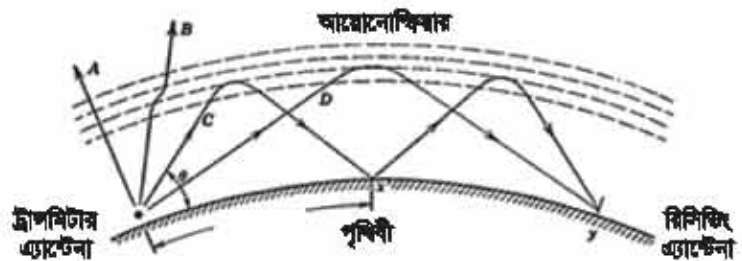
২.২.২ তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)

তার মাধ্যম ছাড়া যখন প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তখন তাকে তারবিহীন বা ওয়্যারলেস মিডিয়া বলে। এটি সম্ভব হয় কারণ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

2.11 চিত্রে Electromagnetic spectrum বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের স্পেকট্রাম দেখানো হয়েছে। এই তরঙ্গের কম্পন যত বেশি হবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত কম হবে। এই স্পেকট্রামের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ আমরা দৃশ্যমান আলো হিসেবে দেখতে পাই। এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়) স্পেকট্রামের দুইটি ক্ষেত্র কমিউনিকেশনে পুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে দুইটি হলো, রেডিওওয়েভ (Radiowave), এবং মাইক্রোওয়েভ (Microwave)।

রেডিওওয়েভ (Radio wave)

3 কিলোহার্টজ থেকে 300 গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে রেডিও ওয়েভ বলা হলেও কমিউনিকেশনের প্রেক্ষিতে সাধারণত 10 কিলোহার্টজ থেকে 1 গিগাহার্টজকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 30km থেকে 30 cm) রেডিও ওয়েভভিত্তিক কমিউনিকেশন বলে বিবেচনা করা হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তাই ব্রডকাস্টের বেসায় রেডিও ওয়েভ বেশি ব্যবহার হয়। রেডিও



চিত্র 2.12: পৃথিবী পৃষ্ঠে রেডিও ওয়েভের প্রচার

কর্ম-৭, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-বা দশ শ্রেণি

ওয়েভ পাঠানোর জন্য যে এন্টেনার প্রয়োজন হয় তার দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আনুমানিক চার ডাগের এক ভাগ হতে হয়। সে কারণে কম ফ্রিকোয়েন্সির (বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) রেডিও ওয়েভ খুব বাস্তবসম্মত নয়। রেডিও ওয়েভ বায়ুমন্ডলে খুব বেশি শোষিত হয় না, ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিভিন্নসহ পাহাড়-পর্বত কিংবা অন্যান্য বাধা অতিক্রম করতে পারে। রেডিও ওয়েভ বায়ুমন্ডলের আয়োনোফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় বলে এটি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পাঠানো সম্ভব। এমনকি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মাইক্রোওয়েভ (Microwave) : মোটাসুটিভাবে 1 গিগাহার্টজ হতে 100 গিগাহার্টজের ভিতরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকেই মাইক্রোওয়েভ বলে। এ ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সাধারণত 2 গিগাহার্টজ বা তার অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে। এটি রেডিও ওয়েভের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, সোজাসুজি যায়। তাই এই কমিউনিকেশনের জন্য ট্রান্সমিটার এন্টেনা ও রিসিভার এন্টেনাকে মুখোমুখি থাকতে হয় বা সংযোগ লাইন অব সাইট (LOS: Line of sight) অবলম্বন করতে হয়। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটি ট্রান্সমিটার (Transceiver) নিয়ে গঠিত হয়, যার একটি সিগন্যাল পাঠায় অন্যটি গ্রহণ করে।

মাইক্রোওয়েভে যোগাযোগ দুধরনের হয়ে থাকে :

১. টেরিস্ট্রিয়াল (Terrestrial) : বা ভূপৃষ্ঠে মাইক্রোওয়েভ সংযোগ এবং
২. স্যাটেলাইট (Satellite) : বা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভ সংযোগ।

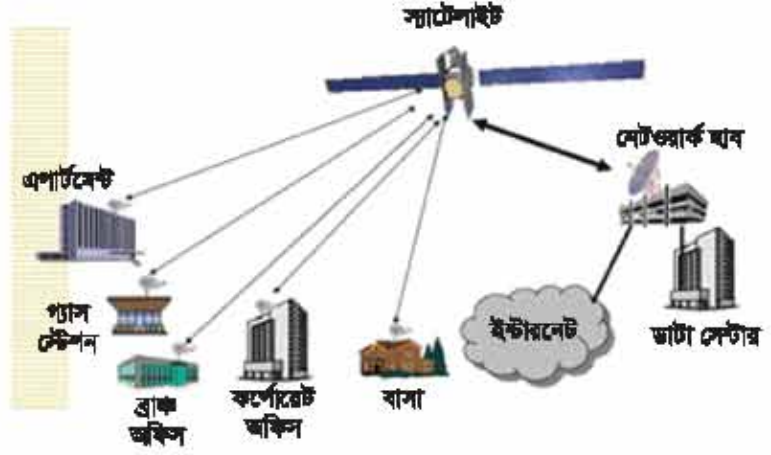
টেরিস্ট্রিয়াল (Terrestrial) : সাধারণত যে সব জায়গায় ক্যাবল ব্যবহার করার অনুপযোগী সে সব স্থানে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার বসানো হয়। মাইক্রোওয়েভ সংকেতের মধ্যে বাধা থাকলে ডেটা স্থানান্তর হয় না, তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন এবং সুষ্ঠু করার জন্য সাধারণত বড় টাওয়ার, উঁচু ভবন বা পাহাড়ে এ টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠের অসমতল এলাকা কিংবা গাছপালা, ভবন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রতি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশন বসাতে হয়।



চিত্র 2.13: টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশনের উদাহরণ

স্যাটেলাইট (Satellite)

মাইক্রোওয়েভ বায়ুমন্ডলের আয়নোচ্ছিন্ন অঞ্চলে যেতে আসতে পারে বলে কৃত্রিম উপগ্রহের (Artificial Satellite) মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভে সিগন্যাল আদান-প্রদান করা শুরু হয়। একটি স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০০ কিমি উচ্চাকাশে স্থাপিত করা হলে সেটি জিওস্টেশনারি হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষে ঘূর্ণনের সমান গতিতে এই স্যাটেলাইট



চিত্র 2.14: স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের উদাহরণ

পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। পৃথিবী থেকে তখন এই স্যাটেলাইটকে আকাশের নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির মনে হয়। সেজন্য ভূমিতে স্থাপিত VSAT (Very Small Aperture Terminal) কে একটি নির্দিষ্ট দিকে আকাশমুখী করে স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু-১ একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট এবং গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে এন্টেনাগুলো আকাশের সেই বিন্দুর দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাপী টি.ভি. চ্যানেলগুলোর সরাসরি সম্প্রচার, প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান এবং আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

২.৩ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communication System)

২.৩.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Wireless Communication System)

টেলিফোনকে ভাঙের সংযোগ থেকে মুক্ত করে ওয়্যারলেস প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা বর্তমান জগতের একটি অনেক বড় অর্জন। সেই টেলিফোন যখন শুধু কথা বলা এবং ম্যাসেজ পাঠানোর মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আরো অসংখ্য কাজে আমাদের সহায়তা করতে শুরু করেছে তখন সবার কাছে একটি নতুন জগতের উন্মোচন হয়েছে। মোবাইল ফোন এখন শখের কিছু নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ওয়্যারলেসবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা চিন্তাও করা যায় না। পারস্পরিক যোগাযোগ, বিনোদন, শিক্ষা, পরিবহন বা চিকিৎসার কাজে একজন মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেভাবে স্মার্টফোনে ওয়্যারলেসের সহায়তা নেয়, ঠিক একইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা, দায়িত্বিক কাজ, আইন-শৃঙ্খলা, প্রতিরক্ষা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপকভাবে ওয়্যারলেস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রস্রাঙ্গী জাহাজ বা উড়োজাহাজ চালনার ভূপৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণকারী স্টেশনের সাথে এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতাবৃদ্ধিতে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের যথেষ্ট ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ। নিরাপত্তা বিশেষত অপরাধী শনাক্তকরণ অথবা প্রমথকারীর অবস্থান কিংবা কোন যানবাহন ট্রাক করার কাজে এ প্রযুক্তির প্রয়োজন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ডিভিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া ইন্টারনেটভিত্তিক আধুনিকতম তথ্যবিনিময় বা যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে অপর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-আইওটি (IOT: Internet of Things)। ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যা ইলেকট্রনিক্স, সফটওয়্যার, সেন্সর, নেটওয়ার্ক সংযোগের সাথে সংযুক্ত ফিজিক্যাল ডিভাইস যা পরিবহন, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, অ্যাকচুয়েটর এবং অন্যান্য ডিজিটাল আইটেমের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত এবং তথ্য বিনিময় করতে সক্ষম। কলে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে বিজ্ঞিং, হোম অটোমেশন, অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, ম্যাসকেকচারিং, কৃষি, চিকিৎসা, এনার্জি ইত্যাদি সেক্টরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। একটি স্মার্ট রিস্ট-ব্র্যান্ড পালস রেট, হার্টবিট, স্ট্রেস লেভেল, কত সময় ঘুঁটাঘুঁটি করা হলো এবং শারীরিক ওজন মাপার কাজ দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে পারে।

২.৩.২ ব্লুটুথ (Bluetooth)

ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং ক্ষপতে ব্লুটুথ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা স্বল্প দূরত্বের মধ্যে তারবিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে। ব্লুটুথ নেটওয়ার্কটির ব্যান্ডউইথ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কম হলেও এটি বহুল ব্যবহৃত। যে সব ডিভাইসে এই পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোকে ব্লুটুথ ডিভাইস বলে। বর্তমানে ল্যাপটপ, ট্যাব, পিজিএ, স্মার্ট ফোনে ব্লুটুথ প্রযুক্তি আলে থেকে নেওয়া থাকে। এছাড়া ইদানীং মাউস, কীবোর্ড, হেডফোন সেট, স্পীকার ইত্যাদিতেও ব্লুটুথ ব্যবহৃত হয়।

এটি একটি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক-প্যান (PAN), 2.45 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং এর ব্যাপ্তি ৩ থেকে ১০ মিটার হয়ে থাকে। হাফ-ডুডেল মোডে এর ডেটা ট্রান্সমিশন রেট প্রায় 1Mbps বা তারচেয়ে বেশি। এটি স্থাপন করা সহজ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগারেশন করা হয়। ব্লুটুথ নেটওয়ার্ককে পিকোনেটও বলা হয় -এর আওতায় সর্বোচ্চ ৪ (চার) টি যন্ত্রের সাথে সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে পারে, এর মধ্যে একটি মাস্টার ডিভাইস এবং বাকিগুলো স্লেভ ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। কভারগুলো পিকোনেট বিলে আবার একটি স্ক্যাটারনেট গঠিত হতে পারে।



চিত্র 2.15: ব্লুটুথের লোগো

২.৩.৩ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)

আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও Wi-Fi কে Wireless Fidelity শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে মনে করা হয়। (Wi-Fi শব্দটি স্বত্বাধিকারী Wi-Fi Alliance নামীয় একটি সংস্থার নির্ধারিত ট্রেডমার্ক) প্রযুক্তিটি বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়্যারলেস প্রযুক্তি যেটা উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারসহ কম্পিউটারের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।



চিত্র 2.16: ওয়াইফাইয়ের লোগো এবং আইকন

এই নেটওয়ার্কের জন্য কোনো লাইসেন্স বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না এবং যেকোনো মানের Wi-Fi ডিভাইস পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় কাজ করতে পারে। সে কারণে ডেটার

নিরাপত্তার ঝানকটা কুঁকি থাকে। এটি সাধারণত 2.4 থেকে 5 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং এর কভারেজ এরিয়া 50 থেকে 200 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে এবং ব্যবহার সহজ হওয়ার কারণে একসাথে অনেক ব্যবহারকারী খুব সহজেই এই নেটওয়ার্কে সিগন্যাল জ্যান তৈরি হতে পারে।

২.৩.৪ ওয়াই-মাক্স (WIMAX)

এটি দ্রুতগতির একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি যেটি প্রচলিত DSL (Digital Subscriber Line) এবং তারবদ্ধ ইন্টারনেটের পরিবর্তে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা দিয়ে থাকে। Worldwide Interoperability for Microwave Access -এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে WiMAX।

এটি সাধারণত 2 থেকে 66 GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং 80 Mbps থেকে 1Gbps পর্যন্ত গতিতে ডেটা ট্রান্সমিটার রেট প্রদানে সক্ষম।



WIMAX এর প্রধান অংশ দুটি :

চিত্র 2.17: ওয়াইমাক্সের লোগো

১. বেস স্টেশন, যেটি ইনডোর ডিভাইস এবং আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। প্রতিটি বেস স্টেশনের কভারেজ এরিয়া 50 থেকে 80 km পর্যন্ত হয়ে থাকে।
২. অ্যাটেনাযুক্ত WIMAX রিসিভার, যা কম্পিউটারে সংযুক্ত করা হয় যেটি ওয়্যারলেস নির্ভর হওয়ার পরিবহনযোগ্য।

এই প্রযুক্তিতে একটি একক বেস স্টেশনের মাধ্যমে বিশাল ভৌগোলিক এলাকায় হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া যায়। ওয়্যারলেস হওয়ার পোর্টেবিলিটির সুবিধা পাওয়া যায় এবং এর রিসিভার সহজে বহনযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের মাধ্যমে শহর এবং গ্রামে পোর্টেবল ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করে।

WIMAX নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অনেক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক হওয়ার অন্যান্য নেটওয়ার্কের তুলনায় এটি ব্যয়বহুল এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।

Bluetooth, Wi-Fi এবং WIMAX-এই তিনটি ওয়্যারলেস প্রযুক্তির তুলনামূলক কার্যকারিতার ছক দেওয়া হলো :

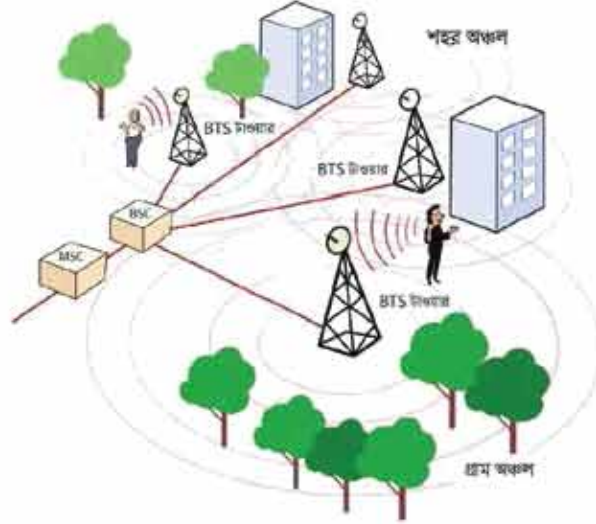
টেবিল 2.2

Name	Bluetooth	Wi-Fi	WiMax
Standard(IEEE)	802.15	802.11	802.16
Frequency (GHz)	2.45	2.4-5	2-66
Speed (Mbps)	0.72-25	11-200	80-1000 (1Gbps)
Range (Meter)	3-10	50-100	10000-50000 (50 km)
Network	WPAN	WLAN	WMAN

২.৪ মোবাইল যোগাযোগ (Mobile Communication)

দুটি ডিভাইসের মধ্যে চলমান বা স্থিতিবদ্ধতার ভাববিহীন যোগাযোগকে মোবাইল যোগাযোগ বলে। বর্তমান বিশ্বে মোবাইল ফোনের সাথে পরিচয় নেই সেরকম মানুষকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মোবাইল ফোনকে কার্যকর

করার জন্য পুরো অঞ্চলকে অসংখ্য সেলে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি সেলে একটি করে বেস স্টেশন থাকে। কোনো একজন ব্যবহারকারী যখন অন্য আর একজনের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তখন তার কলটি নিজের বেস স্টেশনের মাধ্যমে সুইচিং কেন্দ্রে পৌঁছায়। সুইচিং কেন্দ্র খোঁজ করে বের করে যায় কাছে টেলিফোন করা হয়েছে সে কোন সেলে রয়েছে এবং তার কল সেই সেলের বেস স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই বেস স্টেশন নির্দিষ্ট মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে দেয়। মোবাইল টেলিফোনের প্রতিটি সেটই একই সাথে একটি করে



চিত্র 2.18: মোবাইল যোগাযোগ

ওয়ারেন্স ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার। এই প্রযুক্তি আলাদা আলাদা সেলের মাধ্যমে কাজ করে বলে মোবাইল ফোনকে অনেক সময় সেল ফোনও বলা হয়ে থাকে।

শুরুতে শুধু কথা বলার জন্য ফোন উদ্ভাবন করা হলেও বর্তমানে এই ফোন অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং এখন টেলিফোনে কথা বলার সাথে সাথে ভোটা আদান প্রদান করা যায়। আগে যে সমস্ত কাজ শুধু সাত্র কম্পিউটার বা ল্যাপটপের মাধ্যমে করা যেতো এখন তার প্রায় সবকিছুই স্মার্টফোনের মাধ্যমে করা যায়।

২.৪.১ বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন (Different Generations of Mobile Phone)

আমরা বর্তমানে যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছি, শুরুতে তা এমন ছিল না। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে মোবাইল ফোন বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। উন্নয়নের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম নামের অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই মোবাইল ফোনের কার্যক্ষমতা ছিল খুবই কম; দুর্বল নেটওয়ার্কের দ্বারা সীমিত এলাকাভিত্তিক ব্যবহার হতো। 1940 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রথম মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু করে। এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী জাপানের NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল ফোন বা সেলুলার ফোন উৎপাদন শুরু করে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোবাইল ফোন উন্নতির সময়কালকে পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম প্রজন্ম (First Generation-1G: 1979-1990)

টেলিফোন প্রযুক্তিতে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মোবাইল বিশ্বব সাধিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম Motorola Dyna TAC নামে হ্যান্ড মোবাইল সেট চালু করে। একই সময়ে সেখানে AMPS (Advanced Mobile Phone System) স্ট্যান্ডার্ড বাণিজ্যিকভাবে প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু করা হয়। AMPS অ্যানালগ সিস্টেম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করত। এর পাশাপাশি ব্রিটনে TACS (টোটাল অ্যাকসেস কমিউনিকেশন সিস্টেম) সব টেলিফোনে সেমিকন্ডাক্টর ও মাইক্রোপ্রসেসর এবং কম ব্যান্ডের সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হতো। তাই এতে যেকোনো ধরনের মোবাইল অপারেটর কোম্পানির নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুবিধা ছিল না। এছাড়া রোমিং ব্যবস্থা সীমিত ছিল।

**চিত্র 2.19: প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন****দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation-2G: 1991-2000)**

অ্যানালগ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ডিজিটাল ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু হয়। তাই Second Generation-2G কে ডিজিটাল সেলুলার নেটওয়ার্ক বলা হয়। এ সময়ের মোবাইল ফোনের টেকনোলজির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো GSM (Global System for Mobile Communication) এবং CDMA (Code Division Multiple Access) সুবিধা।

**চিত্র 2.20: দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন**

এসব সুবিধা নিয়ে এবং তরসকে নয়েজমুক্ত করার মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের সূচনা হয়।

এছাড়া সেকেন্ড জেনারেশন

মোবাইলকে জিএসএম বা সিডিএমএ স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়। সময়ের পরিবর্তনের মোবাইল হ্যান্ডসেটের আকৃতি ও ওজন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে থাকে। ক্রমাগত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রি-পেইড পদ্ধতি, এসএমএস, এসএমএস ও ইন্টারনেট সেবা চালু হয়। এ সময়ে আন্তর্জাতিক রোমিং সিস্টেম চালু হয়।

তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation-3G: 2001-2008)

জাপানের DoCoMo কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু করে। দ্বিতীয় হতে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত পার্থক্য হলো সার্কিট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের ব্যবহার। সার্কিট সুইচিং পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কিং রিসোর্স বা ব্যান্ডউইথ বিভিন্ন অংশ বা পার্টে বিভক্ত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পথে গন্তব্যে পৌঁছে, যার ফলে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কম। প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কিং রিসোর্স বা ব্যান্ডউইথ বিভিন্ন প্যাকেটে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে গন্তব্যে পৌঁছে এবং এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়। এতে অবশ্য উভয় সুইচিং পদ্ধতি চলে। পূর্বের তুলনায় উচ্চ ব্যান্ডের সিগন্যাল ক্লিকোয়েন্সির ব্যবহার শুরু হয় (ডেটা ট্রান্সমিট রেট 2 Mbps- এর বেশি)।

মূলত এই প্রজন্মের ফোনে নিম্নের চারটি স্ট্যান্ডার্ড চালু হয় :

1. HSPA (High speed package Access)
2. WCDMA (Wide band code division multiple access)
3. 3GPP (3rd Gen Partnership Project)
4. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)।

ভিডিও কল, ইন্টারনেট, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং, FOMA (Freedom of Multimedia access) ইত্যাদি সুবিধা নিয়ে ত্রি-জি মোবাইল ফোন চালু হয়।



চিত্র 2.21: তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

চতুর্থ প্রজন্ম (Fourth Generation-4G: 2009-2020)

চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো সার্কিট সুইচিং বা প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার। ফলে LAN, WAN, VoIP, Internet প্রযুক্তি সিস্টেমে প্যাকেট সুইচিংয়ের পরিবর্তে প্রটোকলভিত্তিক ভয়েস ডেটা ট্রান্সমিটর সম্ভব হচ্ছে। দ্রুত চলনশীল ডিভাইসের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ডেটা ট্রান্সমিট রেট



চিত্র 2.22: চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোন

100 Mbps, ত্রিমাত্রিক এবং স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে 1 Gbps পর্যন্ত হতে পারে। এটি LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে। মোবাইল ওয়েব অ্যাকসেস, আই.পি টেলিফোন, গেমিং সার্ভিসেস, হাই ডেফিনিশন মোবাইল টিভি, ডিডিও কনকারেন্সিং, ব্লিডি টিভি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 4G প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এর গতি 3G-র চেয়ে 50 গুণ বেশি।

পঞ্চম প্রজন্ম (Fifth Generation-5G: 2020- ...)

5G বা পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম মোবাইল ফোনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও সর্বশেষ সংস্করণ। এ ধরনের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়্যারলেস ওয়েব (World Wide Wireless Web) বা সংক্ষেপে WWW নামে পরিচিত। এ ধরনের মোবাইল ফোনের স্ট্যান্ডার্ডগুলোর মধ্যে 5G NR (New Radio), RAT (Radio Access Technology), MIMO (Multiple Input and multiple output) অন্যতম। এই প্রজন্মের মোবাইল ফোনের পারফরম্যান্স 4G-র তুলনায় অনেকগুণ বেশি এবং অনেক দ্রুতগতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে 4K টিভি বা ভিডিও উপভোগ করা যায়।



চিত্র 2.23: পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন

মুগ্ধের সাথে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার উৎকর্ষতার চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করে বিশ্বের মোবাইল ফোন কোম্পানি এবং অন্যান্য বেশ কটি প্রতিষ্ঠান এর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০১৮ সালের শীতকালীন অলিম্পিক গেমস-এ দক্ষিণ কোরিয়া 5G নেটওয়ার্কের ব্যবহার প্রাথমিকভাবে প্রদর্শন করে সফলতা দেখিয়েছে।

২.৫ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking)

আমরা সবাই কম-বেশি নেটওয়ার্কিং শব্দটির সাথে পরিচিত। জালের মতো বিস্তৃতি বোঝাতে নেটওয়ার্ক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ব্যবসা, চাকুরি, রাজনীতি ইত্যাদিতে নিজেদের স্বার্থে স্বয়ং অধিকারের মধ্যে যোগাযোগ কিংবা পারস্পরিক সংযোগ ব্যবস্থা সূচকরণের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। ঠিক একইভাবে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে সংযোগ ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই ধরনের সংযোগ ব্যবস্থার জন্য কিছু বিশেষ ধরনের মিডিয়া এবং নেটওয়ার্ক-ডিভাইস প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষক্রে আলোচনা করা হবে।

২.৫.১ নেটওয়ার্কিংয়ের ধারণা (Concept of Networking)

দৈনন্দিন কাজকর্ম সহজ করার স্বার্থে এবং প্রাথমিক জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্য একজন অপরজনের সাথে পরিচিতি কিংবা নির্ভরশীলতা দিয়ে কিছু আমাদের অজান্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলি। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ও ধরন পরিবর্তনের দ্রুত নেটওয়ার্কিংয়েও অত্যন্ত পরিবর্তন সূচিত হয়। আমরা মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে অডিও, ভিডিও, টেক্সট মেসেজ বিনিময় করে থাকি। এক্ষেত্রে কোনো রকম সংযোগ ব্যতিরেকে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা

বিনিময় সম্ভব; তবে এই ধরনের তথ্য আদান-প্রদান বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করতে হয়। তাই, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে আমরা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা বজায় রেখে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সংযোগ ব্যবস্থাকে বুঝি। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ডেটা স্থানান্তর, ই-মেইল, অনলাইন ব্যাংকিং, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সেবাগ্রহণ ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। কোনো কম্পিউটার অকেজো হয়ে গেলেও নেটওয়ার্কযুক্ত অন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে সবধরনের কাজ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া একটি কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য একাধিক ব্যবহারকারী নিজ নিজ কম্পিউটারের মাধ্যমে অ্যাকসেস ও ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক একইভাবে একটি প্রিন্টার বহু ব্যবহারকারী ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারেন। এভাবেই নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

২.৫.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের উদ্দেশ্য (Objectives of Computer Networking)

দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রিসোর্স শেয়ার করা এবং একসাথে কাজ করা। নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কোনো কম্পিউটারের জন্য ‘রিসোর্স’ হচ্ছে অন্য কম্পিউটারের এমন কোনো উপাদান বা সুবিধা যা তার কাছে নেই। যে কোনো কম্পিউটারের তথ্য কিংবা উপাদানগত সীমাবদ্ধতা এড়ানোর জন্য রিসোর্স শেয়ার করে কাজের সুস্পষ্টতা, গতি এবং ক্ষেত্র বা পরিধি অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায়। তাই কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের মূল উদ্দেশ্যই হলো, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে তথ্য এবং রিসোর্সসমূহ ব্যাপক সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে সহজলভ্য করা। রিসোর্স শেয়ার বলতে যা বোঝানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ার : যে কোনো বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য এখন সবাই ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট সার্চ করে। কিংবা একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য আদান-প্রদান করে দ্রুত ও সহজে কাজ সম্পাদন করা যায়।

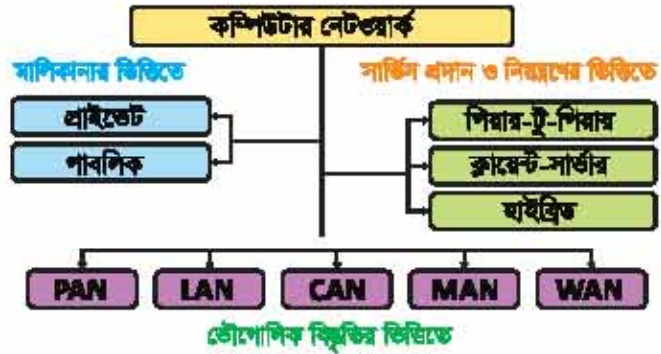
সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার : নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করা যায়। এক্ষেত্রে একটি সফটওয়্যারই যদি নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় তবে একাধিক সফটওয়্যার ক্রয় না করে একটি সফটওয়্যার সবাই ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা লেনদেনের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টারে ভিন্ন ভিন্ন কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেখা যায় তা মূলত একটি সফটওয়্যারকেই সকলে শেয়ার করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দিক দিয়ে ব্যাপক সাশ্রয় ঘটে।

হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার : বিভিন্ন অফিস, ব্যাংক, কম্পিউটার ল্যাব, সাইবার ক্যাফেতে আমরা দেখতে পাই যে অনেক কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সুবিধা দ্বারা শুধু একটি প্রিন্টার সবাই ব্যবহার করছেন। এখানে মূলত প্রিন্টারটি সংযুক্ত থাকে সার্ভার কম্পিউটারে। অন্য কম্পিউটারগুলো (যাদেরকে ক্লায়েন্ট বা ওয়ার্কস্টেশন বলা হয়) নেটওয়ার্কভুক্ত থাকার কারণে সার্ভারের প্রিন্টারটি শেয়ার করতে পারে। আর এতে করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাশ্রয় ঘটেছে।

২.৫.৩ নেটওয়ার্কিংয়ের প্রকারভেদ (Types of Networking)

আধুনিক যুগের বিখ্যাত ব্যবহার্য অবাধ তথ্য প্রবাহ একটি অনিবার্য জীবনানুবাহ। জীবনের সর্বস্তরে তথ্য শেয়ারের এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় নানা ধরনের অল্প কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রচলিত আছে। এ সব নেটওয়ার্কের সাথে বিপুল পরিমাণ কম্পিউটারসহ আরো অনেক আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইসের নেটওয়ার্কসমূহকে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

- নেটওয়ার্কের ভৌগোলিক বিস্তৃতি
- সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
- নেটওয়ার্কের মালিকানা



চিত্র 2.24: নেটওয়ার্কিংয়ের প্রকারভেদ

নেটওয়ার্কের ভৌগোলিক বিস্তৃতি

নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN)
২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN)
৩. ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (Campus Area Network-CAN)
৪. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN)
৫. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN)

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN) : কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহৃত ব্যক্তিগত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়, তাকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN বলে। PAN -এর ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ওয়েব ক্যামেরা, সাউন্ড সিস্টেম, পিজিএ, মোবাইল, ফ্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর পরিধি সর্বোচ্চ 10 মিটার।



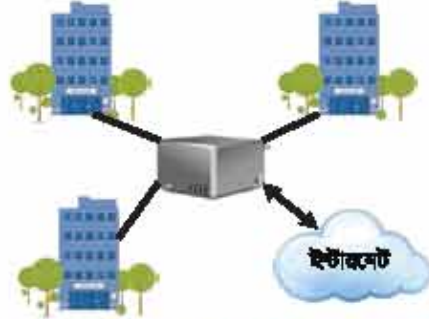
চিত্র 2.25: পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা PAN

২. **লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN) :** দৈনন্দিন জীবনে আমরা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN-ই বেশি ব্যবহার করে থাকি। ছোট অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিংবা একটি বিডিং বা স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত কয়েকটি ভবনে স্থাপিত অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এতে অনেক ডিভাইস অ্যাকসেস পাওয়া যায় এবং রিগিটার ব্যবহার করে এর বিস্তৃতি সর্বোচ্চ ১ কিমি করা যায়। LAN -এর টপোলজি সাধারণত স্টার, বাস, ট্রি ও রিং হয়ে থাকে। এই ধরনের নেটওয়ার্কে তার মাধ্যম হিসেবে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-অক্সিয়াল ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল এবং তারবিহীন মাধ্যম হিসেবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।



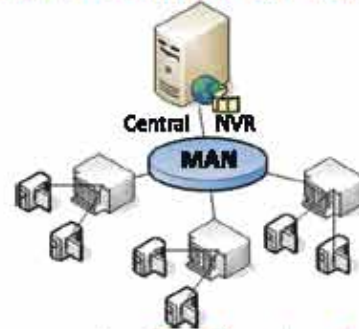
চিত্র 2.26: লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN

৩. **ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক (Campus Area Network-CAN) :** অনেক LAN -এর সমন্বয়ে CAN গঠিত হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি ভবন, স্টুডেন্ট সেন্টার, আবাসিক হলসমূহ, জিমনেসিয়াম এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ভবনে স্থাপিত LAN গুলোকে সংযুক্ত করতে CAN ব্যবহার করা হয়। এর বিস্তৃতি ১ থেকে ৫ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বড় অফিস কমপ্লেক্সের একাধিক ভবনে LAN ব্যবহারকারীদের কাজের সমন্বয়ের জন্য কিংবা ব্যয়বহুল এক বা একাধিক পেরিফেরাল ডিভাইস অনেক ব্যবহারকারীর জন্য CAN ব্যবহার করা হয়। যেমন- Googleplex এবং Microsoft's -এর নেটওয়ার্ক।



চিত্র 2.27: ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক বা CAN

৪. **মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN) :** মেট্রোপলিটন এরিয়া বলতে একটি শহর বা ছোট অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত এলাকাকে বোঝায়, এ রকম একটি বড় এলাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অনেকগুলো কম্পিউটার নিয়েই MAN গঠিত হয়। MAN -এর বিস্তৃতি LAN -এর চেয়ে বড় কিন্তু WAN -এর চেয়ে ছোট হয়। প্রায় ৫০ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত MAN -এর নেটওয়ার্ক থাকতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্কে যখন তারবিহীন সংযোগ দেওয়া হয়, তখন তাকে WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) বলা হয়। ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় টেলিকোন লাইন, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, রেডিও ওয়েভ বা টেরিষ্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ। নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসেবে রাউটার, সুইচ, হাব, ব্রিজ, গেটওয়ে ইত্যাদি এই নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র 2.28: মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN

৫. **ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN)** : ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক দিয়ে বড় ধরনের এলাকাজুড়ে নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করা হয়। একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটারের মধ্যে গড়ে তোলা নেটওয়ার্কই ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN নামে পরিচিত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় WAN-এর উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।

সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ডিভাইসসমূহ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সেগুলোর সার্ভিস মডেল কেমন হবে, তার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা :

১. পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)
২. ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client Server Network)
৩. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)



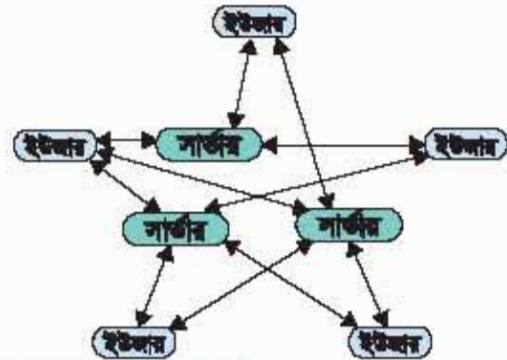
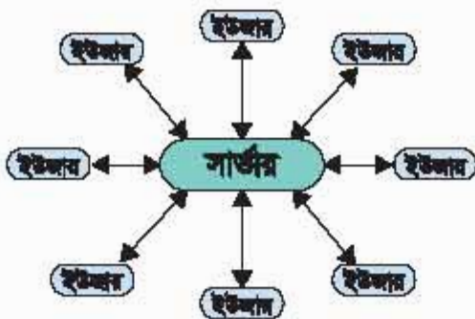
চিত্র 2.29: ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN

১. **পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network)** : পৃথক সার্ভার কম্পিউটার ব্যতীত দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে রিসোর্স শেয়ার করার জন্য যে নেটওয়ার্ক গঠন করা হয় তা হলো পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক।

২. **ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client Server Network)**: একাধিক ক্লায়েন্ট/ওয়ার্কস্টেশন ও একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সমন্বয়ে ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়। এখানে সার্ভার কম্পিউটারে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা জমা রাখা হয় এবং এসব ডেটা নেটওয়ার্কে অবস্থিত ক্লায়েন্ট কম্পিউটার কর্তৃক রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার (শেয়ার) করা হয়। একে সার্ভার-বেজড নেটওয়ার্কও বলা হয়।

স্টোরেজ মিডিয়া, হোস্ট ও টার্মিনাল (ক্লায়েন্ট/ইউজার/নোড) সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ককে আবার সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network) এবং ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network) এই দুভাবে ভাগ করা যায় :

ক. **সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network)** : এ ধরনের নেটওয়ার্কে সাধারণত একটি প্রধান কম্পিউটার থাকে, যাকে হোস্ট কম্পিউটারও বলে এবং কিছু টার্মিনাল দিয়ে গঠিত হয়।



চিত্র 2.30: সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক এবং ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক

খ. **ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network)** : এ ধরনের নেটওয়ার্ক পরস্পর সংযুক্ত কিছু ওয়ার্কস্টেশন বা টার্মিনাল, বিভিন্ন শেয়ারড স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

৩. **হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)** : এটি মূলত পিয়ার-টু-পিয়ার ও ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে হোস্ট কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেসিং-এর পাশাপাশি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য (যেমন- গ্লোবাল স্টোরেজ মিডিয়া) বিদ্যমান থাকায় কর্পোরেট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই নেটওয়ার্কে ক্লায়েন্ট সার্ভারের প্রাধান্য বেশি থাকে।

নেটওয়ার্কের মালিকানা

নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রধানত পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network) এবং প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network)** : যে নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেকোনো সময় যেকোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে, তাকে পাবলিক নেটওয়ার্ক বলে। এ ধরনের নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয় অনেক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে, অর্থাৎ এর একক মালিকানা থাকে না। এর ব্যবহারকারীকে সাধারণত ফিস বা মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। WAN বা ইন্টারনেট এ ধরনের নেটওয়ার্কের উদাহরণ।

২. **প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network)** : যে নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত এবং কোনো কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়, তাকে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বলে। কেউ ইচ্ছা করলেই এই নেটওয়ার্কে অ্যাকসেস করতে পারে না। এ ধরনের নেটওয়ার্ক পরিচালিত হয় একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে। এর সিকিউরিটি সিস্টেম মজবুত এবং এতে ট্রাফিক নেই বললেই চলে। ডেটা আদান-প্রদানে ডিলে (Delay) কম হয়। PAN, LAN বা CAN এ ধরনের নেটওয়ার্ক।

২.৫.৪ নেটওয়ার্ক ডিভাইস (Network Devices)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কম্পিউটারগুলো যুক্ত করতে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে নেটওয়ার্ক ডিভাইস বলা হয়। এসব যন্ত্রপাতি মূলত নেটওয়ার্কে ডেটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংকেত ও ডেটাকে তার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে :

- মডেম
- হাব
- রাউটার
- গেটওয়ে
- সুইচ
- নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

মডেম (MODEM) : নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি গড়ে ওঠার আগে টেলিফোন লাইন (এবং কখনো কখনো টেলিভিশনের ক্যাবল লাইন) ব্যবহার করে নেটওয়ার্কিং করার জন্য মডেম উদ্ভাবিত হয়েছিল। মডেম (MODEM) শব্দটি Modulator ও Demodulator শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে ফাইবার এবং ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার কারণে মডেমের ব্যবহার বিলুপ্তির দিকে।

হাব (HUB) : একটি কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটার বা ডিভাইসের নেটওয়ার্কিং করার জন্য হাব ব্যবহৃত হয়। হাবের পোর্টগুলোতে কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং পোর্টগুলো সংযুক্ত করা হলে একটি LAN তৈরি হয়ে যায়। হাবের ভেতরে কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই, এটি বিভিন্ন ডিভাইসের নেটওয়ার্কিং পোর্টগুলোর ভেতর একধরনের পরিবাহিক বোণাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি হাবে প্রেরিত যেকোনো সংকেত কোনোমুণ পরিবর্তন ছাড়াই সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসে ব্রডকাস্ট করে, এক্ষেত্রে সংকেতটি যে ডিভাইসের জন্য পাঠানো হয়েছে সেই ডিভাইসটিই শুধু সংকেত গ্রহণ করে, বাকি ডিভাইসগুলো সংকেত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। সে কারণে হাবে ভেটা কমিশন বা সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে এবং নেটওয়ার্কে ট্রাফিক জ্যাম বেড়ে যায়। বর্তমানে হাবের ব্যবহার বিলুপ্তির পথে।

সুইচ (Switch) : নেটওয়ার্কিং করার জন্য বর্তমানে হাবের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে সুইচ ব্যবহৃত হয়। কার্যক্রমের দিক থেকে হাব এর সাথে সুইচের ভেতন কোনো পার্থক্য নেই তবে সুইচের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। সুইচ কোনো সংকেতকে ব্রডকাস্ট



চিত্র 2.31: সুইচ

করে না, সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য প্রতিটি কম্পিউটারের MAC (Media Access Control) অ্যাড্রেস ব্যবহার করে শুধু নির্দিষ্ট পোর্টে সিগন্যালটি পাঠায়। শুধু তাই নয় দুর্বল হয়ে পড়া সংকেতটিকে অ্যামপ্লিফাই (বর্ধিত) করে শক্তিশালী কম্পিউটারের পোর্টে প্রেরণ করে।

সুইচে পোর্টের সংখ্যা ৪, ১৬, ২৪ থেকে ৪৪ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এতে ভেটা ফিল্টারিং (প্রকৃত সিগন্যাল থেকে নয়েজ সিগন্যাল বাদ দেয়া) করা সম্ভব তবে ব্যবহারের দিক থেকে একটু জটিল। একটি সুইচ দিয়ে একটি LAN তৈরি করা যায়, একাধিক LAN তৈরি সম্ভব নয়।

রাউটার (Router) : রাউটার এমন একটি কানেকটিং ডিভাইস যা একই প্রটোকলভুক্ত (নেটওয়ার্কের নিয়মকানুনসমূহ) দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র নেটওয়ার্কের সংযোগ করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে পারে। এর মাধ্যমে একই ধরনের ছোট আকারের ভিন্ন ভিন্ন গঠনের একাধিক LAN সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়। WAN-এর সাথে একটি LAN যুক্ত করতে রাউটার ব্যবহৃত হয়। রাউটার NAT (Network Address Translation) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে থাকে।

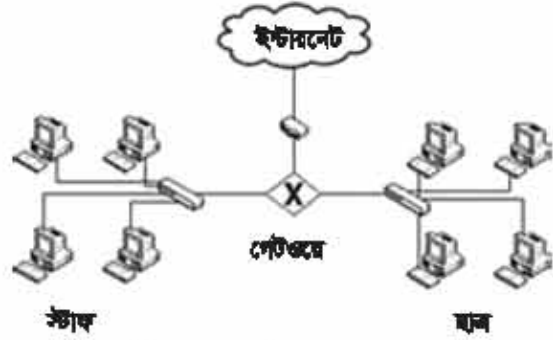


চিত্র 2.32: রাউটার

একটি নেটওয়ার্ক থেকে পাওয়া ভেটা সংকেত রাউটার সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ ব্যবহার করে অন্য নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট ডিভাইসে পাঠাতে পারে। কোনো একটি ভেটা প্যাকেটকে কোন পথ দিয়ে পাঠানো সবচেয়ে সুবিধাজনক রাউটার সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাউটার ভেটা ফিল্টারিং করতে পারে। নেটওয়ার্কে ভেটার আধিক্য এবং ব্যস্ততা দেখতে পেলে রাউটার সেই রুট (পথ) পরিহার করে অন্য রুট (পথ) দিয়ে ভেটা

পাঠাতে সক্ষম হয়। তবে এর কনফিগারেশন অলেকাকৃতভাবে একটু জটিল। একই প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মাঝে সংযোগ স্থাপন করলেও রাউটার ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্কের মাঝে সংযোগ স্থাপনে করতে পারে না।

গেটওয়ে (Gateway) : ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য গেটওয়ে ব্যবহৃত হয়। এটি একই ধরনের বা ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকলবিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেয় অর্থাৎ এটি মূলত একটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস। অপেক্ষাকৃত দারি এবং কনফিগারেশন জটিল প্রকৃতির হলেও গেটওয়ে ও রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়। গেটওয়ে PAT (Protocol Address Translation) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে থাকে বলে একে প্রটোকল কনভার্টার বলে। এটি ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে এবং শুধু টার্গেট আই.পি. অ্যাড্রেসে সংকেত পাঠায়। এটি রাউটারের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং ডেটার সংঘর্ষ বা কলিশন আশঙ্কা কম।



চিত্র 2.33: গেটওয়ের ব্যবহার

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) : একসময় কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইসকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য আলাদা করে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC: Network Interface Card) ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে কম্পিউটারগুলোতে এই কার্ড বিস্ট-ইন অবস্থায় থাকে বলে আলাদাভাবে এর ব্যবহার বিলুপ্তির পথে।

২.৫.৫ নেটওয়ার্কের কাজ (Functions of Network)

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রধান কাজ হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং এবং ডেটা কমিউনিকেশন করা। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকা একাধিক কম্পিউটার ও পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো নিম্নলিখিত নেটওয়ার্কের কাজগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানে সহায়তা করা এবং রিসোর্সের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করা।
২. ব্যবহারকারীর অ্যাকসেস নিয়ন্ত্রণ-পারবেকশনসহ তার সময় এবং আর্থিক সাশ্রয় ঘটানো।
৩. তথ্যের সহজ প্রাপ্তি ও দ্রুততা নিশ্চিতকরণ।
৪. বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের সাথে কম সময়ের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থাকরণ।
৫. শিক্ষা, চিকিৎসা, আর্থিক বিষয়, ক্যারিয়ার পঠন, হোটেল বা ফ্লাইট বুকিংসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার।
৬. সার্ভার কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৭. ডেটার ব্যাকআপ রাখা। ব্যবহারকারীকে নিরাপদ ও সহজ অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদান করা।
৮. স্পর্শকাতর ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারকারীকে আপডেটেড তথ্য সরবরাহ করা।
৯. সিস্টেমকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারকারী থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা।

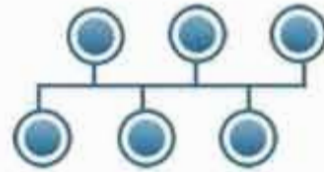
২.৫.৬ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)

নেটওয়ার্ক টপোলজি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো কীভাবে অপর কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়ে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে, তার পরিকল্পনা বা ধারণা। এতে নেটওয়ার্কে ডেটা আদান-প্রদান সহজসাধ্য এবং সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ করা। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলোর ভৌত সংযোগ বিন্যাস এবং নির্বিঘ্নে ডেটা আদান-প্রদানের যুক্তিনির্ভর সুনিয়ন্ত্রিত পথের পরিকল্পনা, এ দুইয়ের সমন্বিত ধারণাই নেটওয়ার্ক টপোলজি। একটি কম্পিউটার-নেটওয়ার্কে কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি থাকতে পারে। নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের (কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য পেরিফেরাল যন্ত্র) সংযোগস্থলকে সাধারণভাবে নোড (Node) নামে অভিহিত করা হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সাধারণত নিচে উল্লিখিত টপোলজিগুলো ব্যবহার করা হয়।

১. বাস টপোলজি (Bus Topology)
২. রিং টপোলজি (Ring Topology)
৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)
৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
৫. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)
৬. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

বাস টপোলজি (Bus Topology)

এ ধরনের টপোলজিতে একটি সংযোগ লাইনের সাথে সবধরনের নোড অর্থাৎ কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে। এই প্রধান সংযোগ লাইনকে বাস (Bus) বলা হয়, যা কো-এক্সিয়াল অথবা ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে তৈরি হয়। এটি নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করে। এর লাইনের দু'প্রান্তে দুটি টার্মিনেটর থাকে।



চিত্র 2.34 : বাস টপোলজি

নেটওয়ার্কের প্রতিটি নোড স্বতন্ত্রভাবে বাসে সংযুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহ ব্যবস্থা হয় দ্বিমুখী। ডেটা পাঠানোর প্রয়োজন হলে প্রেরক কম্পিউটার এ লাইনে ডেটা পাঠিয়ে দেয়। প্রেরিত ডেটার সাথে গ্রাপক শনাক্তের তথ্যও থাকে।

বাসের সাথে যুক্ত অন্যান্য প্রতিটি কম্পিউটার বাসে প্রবাহিত ডেটা পরীক্ষা করে দেখে। শুধু গ্রাপক কম্পিউটারই ডেটা গ্রহণ করে, অন্যগুলো এই ডেটা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

বাস টপোলজির সুবিধা

১. কম তার এবং সরল সংগঠনের কারণে বাস টপোলজি ইনস্টলেশন সহজ ও সাশ্রয়ী।
২. কানেটর বা রিগিটার দ্বারা সহজেই নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বাস -এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ঘটানো যায়।
৩. নেটওয়ার্কে যে কোনো সময়ে নতুন নতুন ডিভাইস বা কম্পিউটার সংযুক্ত করা যায়।
৪. কোনো কম্পিউটার বিচ্ছিন্নকরণ বা নষ্ট হলেও সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে না।
৫. নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।

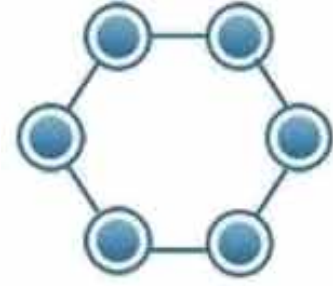
কর্ম-৯, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

বাস টপোলজির অনুবিধা

১. ডেটা ট্রান্সমিশন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপন্থিতে সম্পন্ন হয়।
২. প্রধান সংযোগ লাইন বা বাস-এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।
৩. নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি গেলে ব্যাপক ত্রুটি হয় এবং পত্তি হ্রাস পায়।
৪. ডেটা সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রিং টপোলজি (Ring Topology)

যে টপোলজিতে রিং-এর মতো কম্পিউটার নোডগুলো চক্রাকার পথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গঠন করে তাকে রিং টপোলজি বলে। এই ক্রমাকার নেটওয়ার্কে প্রথম ও সর্বশেষ কম্পিউটার পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এবং এতে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।



চিত্র 2.35: রিং টপোলজি

নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার ডেটা প্রেরণের জন্য সমান অধিকার পায়। একটি নোড সংকেত পাঠালে তা পরবর্তী নোডের কাছে যায়। সংকেতটি ঐ নোডের জন্য হলে সেটি সে নিজে গ্রহণ করে, অন্যথায় উক্ত নোড সংকেতকে তার পরবর্তী নোডের কাছে প্রেরণ করে। সঠিক নোডে না পৌঁছানো পর্যন্ত ক্রমাকার নেটওয়ার্ক পথে সংকেত পরিভ্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে তার কাঙ্ক্ষিত নোডে পৌঁছে যায়।

রিং টপোলজির সুবিধা

১. এই টপোলজিতে হোস্ট কম্পিউটার বা কেন্দ্রীয় সার্ভারের দরকার হয় না।
২. সংকেত প্রবাহ একমুখী হওয়ার ডেটা কলিশন বা সংঘর্ষ হয় না।
৩. প্রতিটি কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সমিশনে সমান গুরুত্ব পায়।
৪. তারের পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়, তাই বাস্তবায়ন খরচ কম।

রিং টপোলজির অনুবিধা

১. এই টপোলজিতে সংকেত আদান-প্রদান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপন্থিতে সম্পন্ন হয়।
২. একমুখী ক্রমাকার পথে সংযুক্তির কারণে একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারকে সরাসরি ডেটা প্রেরণ করতে সক্ষম হয় না এবং কোনো নোড অকার্যকর হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়ে।
৩. কোনো নতুন কম্পিউটার সংযোজন বা বিয়োজনে পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম বাহত হয়।
৪. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যা বাতালে ডেটা ট্রান্সমিশনের সমস্যাও বেড়ে যায়।
৫. এই টপোলজি নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত সফটওয়্যারের দরকার হয়।

স্টার টপোলজি (Star Topology)

যে টপোলজিতে কম্পিউটার বা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন- প্রিন্টার, সরাসরি একটি হাব বা সুইচের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে স্টার টপোলজি বলে। এ পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো এই হাব বা সুইচের মাধ্যমে একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগ ও ডেটা আদান-প্রদান করে। ফলে সংকেত আদান-প্রদানে কম সময় প্রয়োজন হয় এবং সংকেত সংঘর্ষের আশঙ্কা কম থাকে। সংকেত প্রবাহ দ্বিমুখী হয়। হাব বা সুইচ বা সার্ভার দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত স্টার টপোলজির নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা শনাক্ত করা সহজ হয়। সাধারণত এই টপোলজিতে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা গেলেও টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহারের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র 2.36: স্টার টপোলজি

স্টার টপোলজির সুবিধা

১. অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ডেটা আদান-প্রদান হয়।
২. সংকেত সংঘর্ষ ঘটার আশঙ্কা কমে।
৩. সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সচল রেখেই যে কোনো সময়ে নেটওয়ার্কে নতুন নোড যুক্ত করা যায়।
৪. কোনো নোড বিচ্ছিন্ন বা অচল হলেও নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ সচল থাকে।
৫. সুইচ ব্যবহারের কারণে বাস বা রিং টপোলজির তুলনায় এর ডেটা নিরাপত্তা বেশি।
৬. কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি গেলেও ডেটা ট্রান্সমিশনের গতি স্বাভাবিক থাকে।

স্টার টপোলজির অসুবিধা

১. হাব বা সুইচ বা সার্ভার অচল হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অকাজ্যে হয়ে পড়ে।
২. প্রতিটি নোডের জন্য পৃথক পৃথক তারের প্রয়োজন হয় তাই এতে অপেক্ষাকৃত বাস্তবায়ন ব্যয় বেশি।
৩. নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো পরস্পরের মধ্যে সরাসরি ভাষা বা ডেটা আদান-প্রদানে সক্ষম হয় না।

ট্রি টপোলজি (Tree Topology)

ট্রি টপোলজিতে কম্পিউটার বা নোডগুলো পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার ন্যায় বিন্যস্ত ও যুক্ত থাকে। এতে একাধিক স্তরের কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটার বা সার্ভারের সাথে যুক্ত থাকে। এই হোস্ট কম্পিউটারের সাথে স্তর বিন্যাস বা হায়ারার্কি (Hierarchy) অনুসারে বিভিন্ন স্তরের ডিভাইস নেটওয়ার্ক হাব বা সুইচের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এজন্য এটিকে হায়ারার্কিক্যাল টপোলজিও বলা হয়। এ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরের কম্পিউটার তার পরবর্তী স্তরের কম্পিউটারের জন্য অন্তর্বর্তী হোস্ট কম্পিউটার হিসেবে কাজ করে। যে কম্পিউটারের পরে আর কোনো কম্পিউটার যুক্ত হয় না সেই কম্পিউটারকে পেরিফেরাল টার্মিনাল বা প্রান্তীয় কম্পিউটার বলে। ট্রি টপোলজির নেটওয়ার্ক সহজেই সম্প্রসারণ করা যায়। একেত্রে ডেটা প্রবাহ হয় দ্বিমুখী।



চিত্র 2.37: ট্রি টপোলজি

মি টপোলজির সুবিধা

১. যে কোনো সময়ে নতুন শাখা সৃষ্টি করে এর নেটওয়ার্ক সহজেই সম্প্রসারিত করা যায়।
২. বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গঠনে অন্যান্য টপোলজির তুলনায় এটি বেশি সুবিধা প্রদান করে।
৩. কোনো নোড বিচ্ছিন্ন বা নতুন নোড যুক্ত করা হলে নেটওয়ার্ক কার্যক্রম ব্যাহত হয় না।
৪. ভোটা নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি।
৫. নেটওয়ার্কের কোনো শাখা নষ্ট হলে, সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে না।

মি টপোলজির অসুবিধা

১. প্রধান কম্পিউটার নষ্ট হলে সমগ্র নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে।
২. অন্যান্য টপোলজির তুলনায় অটিল প্রকৃতির।
৩. বাস্তবায়ন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি।
৪. অতীবর্তী কম্পিউটারগুলো অচল হলে নেটওয়ার্কের অংশবিশেষ অকেজো হয়ে পড়ে।

মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

যে টপোলজিতে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত অন্য প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে তাকে মেশ টপোলজি বলা হয়। এতে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর সাথে সরাসরি অপেক্ষাকৃত দ্রুত ভোটা আদান-প্রদান করতে পারে। এতে কেন্দ্রীয় সার্ভার বা ডিভাইসের দরকার পড়ে না। এই নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট (পিয়ান-টু-পিয়ান) লিংক বলা হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে আন্তঃসংযুক্ত (Completely interconnected) টপোলজি নামেও পরিচিত। প্রচুর পরিমাণ তারের প্রয়োজন এবং বেশি কম্পিউটার ব্যবহৃত হওয়ায় এই টপোলজি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর অটিল কনফিগারেশনের জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সাধারণত এটি ব্যবহার করা হয় না।



চিত্র 2.38: মেশ টপোলজি

এই টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য প্রতিটি নোডে $(n-1)$ টি সংযোগের প্রয়োজন হয়। নেটওয়ার্কে মোট তারের সংখ্যা হবে $\frac{n(n-1)}{2}$ । ভোটা যোগাযোগের নির্ভরশীলতাই যেখানে মুখ্য, সেসব ক্ষেত্রে মেশ টপোলজি ব্যবহার করা হয়। যেমন- প্রতিরক্ষা বা ব্যাংকিং -এর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার রয়েছে।

মেশ টপোলজির সুবিধা

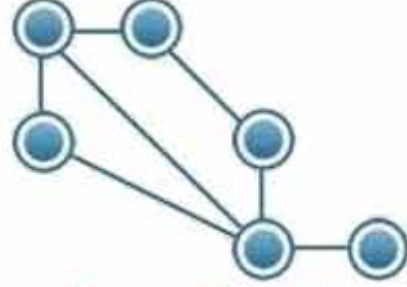
১. অন্যান্য সব ধরনের টপোলজির তুলনায় এতে ভোটা ট্রানমিশন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়।
২. নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভোটা ট্রানমিশনের গতি কমে না।
৩. নেটওয়ার্কে যেকোনো কম্পিউটার নষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হলেও নেটওয়ার্ক সচল থাকে।
৪. কোনো সংযোগ তার নষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হলে বিকল্প সকল কম্পিউটারে ভোটা আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে।
৫. নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয় কোনো ডিভাইস বা সার্ভারের প্রয়োজন হয় না।

মেশ টপোলজির অসুবিধা

১. বেশি পরিমাণ তার ও অতিরিক্ত লিংক প্রয়োজন হওয়ায় এটি ব্যয়বহুল।
২. নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন অত্যন্ত জটিল।
৩. নেটওয়ার্কে কম্পিউটার সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে তারের পরিমাণও বেড়ে যায়।

হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

স্টার, রিং, বাস, বেশ প্রভৃতি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে হাইব্রিড টপোলজি বলে। বিশেষ কোনো কাজের ক্ষেত্রে একটিমাত্র টপোলজি স্বয়ংসম্পূর্ণ না-ও হতে পারে।



চিত্র 2.39: হাইব্রিড টপোলজি

এমন্য এসব ক্ষেত্রে হাইব্রিড টপোলজি ব্যবহৃত হয়। হাইব্রিড টপোলজির উপর ভিত্তি করে ইন্টারনেট গঠন করা হয়েছে। কেননা এতে প্রায় সব ধরনের টপোলজির নেটওয়ার্কই সংযুক্ত আছে। হাইব্রিড নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা নির্ভর করে ঐ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টপোলজির উপর।

হাইব্রিড টপোলজির সুবিধা

১. এতে ঘাব বা সুইচ যুক্ত করে প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা যায়।
২. এই নেটওয়ার্কের ট্রাবল শ্যুটিং সহজতর।
৩. একটি টপোলজি নষ্ট হলে অন্য কোনো টপোলজির উপর প্রভাব পড়ে না।
৪. যেহেতু এটি মিশ্র টপোলজি তাই এতে ব্যবহৃত টপোলজিগুলোর সুবিধাগুলোও এতে অন্তর্নিহিত থাকে।

হাইব্রিড টপোলজির অসুবিধা

১. টপোলজির সংখ্যা বেশির কারণে এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া জটিল।
২. এই টপোলজির ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল প্রকৃতির।
৩. মিশ্র টপোলজি হিসেবে এতে ব্যবহৃত টপোলজিগুলোর অসুবিধাগুলোও এতে অন্তর্নিহিত থাকে।

২.৫.৭ ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

আমরা সবাই জানি, তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার দরুন আজকের যুগে আমরা নিজের ঘরের কোশে বসে নিজস্ব ছোট কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে একটি বিশালাকার কম্পিউটারকে ভাড়ার মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেই কম্পিউটারে সংরক্ষণও করতে পারি। এই বিশালাকার কম্পিউটারের ধারণাটিই ক্লাউড কম্পিউটিং।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিগত সবকিছুই চলছে এই ক্লাউড কম্পিউটিং ধারণার উপর ভিত্তি করে। ‘ক্লাউড’ শব্দটি বৃষ্ণক অর্থে ব্যবহৃত। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো ব্যবহারকারী পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিশাল তথ্যভান্ডার দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে পারেন। আমরা বর্তমানে যারা কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করি তাদের প্রায় সবাইই Facebook, E-mail বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একাউন্ট রয়েছে। আমরা ইচ্ছানুযায়ী এসব একাউন্টের মাধ্যমে চ্যাটস দিচ্ছি কিংবা মেইল আদান-প্রদান করে থাকি। এসব সেবা গ্রহণের জন্য আমাদেরকে কোনো টাকা খরচ করতে হয় না। কেননা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইসব সার্ভিস বা সেবা প্রদানকারী বেশকিছু কোম্পানীর বিপুল সংখ্যক সার্ভার রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা অসংখ্য ক্লায়েন্টকে একই সময়ে সার্ভিস প্রদান

করে যাচ্ছেন। আবার কিছু সংখ্যক সার্ভিস রয়েছে যেগুলো অর্থের বিনিময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা দান করে থাকেন। বিনামূল্যের এবং অর্থের বিনিময়ে উভয় প্রকার সার্ভিস ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে কম্পিউটার রিসোর্স যেমন- হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকে, ক্রেতা বা ব্যবহারকারী নিজস্ব কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভিসদাতা সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় কম্পিউটিংয়ের কাজ সমাধা করে থাকে। ক্লাউড কম্পিউটিংকে সমন্বিত টেকনোলজি হিসেবে গণ্য করা হয়, যার দ্বারা ব্যবহারকারী এবং সার্ভিস প্রদানকারী উভয়ই ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন।

ক্লাউড কম্পিউটিং পদ্ধতিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রাইভেট ক্লাউড (Private Cloud) : একক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় কিংবা থার্ড পার্টির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় যাতে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এ ধরনের ক্লাউডকে প্রাইভেট ক্লাউড বলে। এ সব পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তবে অনেক বড়ো প্রতিষ্ঠানের অনেক শাখায় ডেটা সেন্টার না বসিয়ে একটিমাত্র ক্লাউড ডেটা সেন্টার স্থাপন করলে প্রতিষ্ঠানটির জন্য সাশ্রয়ী হয়।

পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud) : জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্লাউডকে পাবলিক ক্লাউড বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলের বিনামূল্যে বা স্বল্প ব্যয়ে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, স্টোরেজ এবং অন্যান্য রিসোর্স ইত্যাদির সার্ভিসযুক্ত ক্লাউড-ই পাবলিক ক্লাউড। Amazon, Microsoft এবং Google ইত্যাদি তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টারে পাবলিক ক্লাউডের অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে।

হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud) : দুই বা ততোধিক ধরনের ক্লাউড (প্রাইভেট, পাবলিক বা কমিউনিটি) - এর সংমিশ্রণই হলো হাইব্রিড ক্লাউড। বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড পৃথক বৈশিষ্ট্যের হলেও একে একে সাথে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। ক্লাউড সার্ভিসের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য একাধিক ক্লাউডকে একীভূত করা হয়ে থাকে।

২.৫.৮ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধা (Advantages of Cloud Computing)

ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এ সব সার্ভিস মডেলকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

অবকাঠামোগত সেবা (IaaS: Infrastructure as a service) : এই মডেলে অবকাঠামো ভাড়া দেওয়া হয়। অ্যামাজন -এর ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড (EC2) এরকম একটি মডেল। EC2 -এর প্রতিটি সার্ভারে ১ থেকে ৮টি ভার্চুয়াল মেশিনে চলে, ক্রেতারা এগুলোই ভাড়া নিয়ে থাকেন। ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়াল মেশিনে নিজেদের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে নিজের নিয়ন্ত্রণে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালাতে পারেন।

প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (PaaS: Platform as a service) : এই মডেলে ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেওয়া হয় কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এক্সিকিউশন পরিবেশ, ডেটাবেজ এবং ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি। এই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারী স্বল্প ব্যয়ে তার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার উন্নয়ন করতে পারেন। Microsoft -এর Azure এবং Google -এর App Engine এই মডেলের উদাহরণ।

সফটওয়্যারভিত্তিক সেবা (SaaS: Software as a service) : এই মডেলে ব্যবহারকারীরা সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা সফটওয়্যার ও ডেটাবেজে অ্যাকসেস এবং ব্যবহারে সুযোগ পায়। এর ফলে

ব্যবহারকারীকে সিপিইউ বা স্টোরেজের অবস্থান, কনফিগারেশন ইত্যাদি জানা বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। Google Apps, Dropbox, Hubspot ইত্যাদি এই মডেলের উদাহরণ।

নেটওয়ার্কভিত্তিক সেবা (NaaS: Network as a Service) : এটি এমন একটি মডেল, যেখানে গ্রাহকরা তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপনের পরিবর্তে ক্লাউড বিক্রেতার কাছ থেকে নেটওয়ার্ক পরিষেবাগুলো ভাড়া নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ আর্চাকা এবং পার্টিনো সংস্থা দুটি WAN এবং SVPN (Secure Virtual Private Network) সেবা প্রদান করে থাকে।

এ ছাড়াও ক্লাউড সার্ভিসের ব্যবহারকারীরা নিচের সুবিধাগুলো ভোগ করে থাকে :

যত চাহিদা তত সার্ভিস (Resource Flexibility/Scalability) : ছোট কিংবা বড় যে কোনো ক্রেতার সব রকম চাহিদা মেটানো হবে, ক্রেতা যত চাইবে সার্ভিসদাতা তত পরিমাণে সার্ভিস দিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছে অনুযায়ী চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

যখন চাহিদা তখন সার্ভিস (On Demand) : ক্রেতা যখনই চাইবে সার্ভিসদাতা তখনই সার্ভিস দিতে পারবে। ক্রেতা যে সময় ইচ্ছে সার্ভিস চাইতে পারবে এবং সে সময়ই সার্ভিসদাতা তার চাহিদা পূরণ করবে।

যখন ব্যবহার তখন মূল্য শোধ (Pay as you go) : ক্রেতাকে আগে থেকেই কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যতটুকু ব্যবহার করবে, শুধু ততটুকুর জন্যই মূল্য পরিশোধ করবে।

উদ্যোক্তাদের সুযোগ (Opportunity for Entrepreneurs) : সার্বক্ষণিক ব্যবহারযোগ্য ক্লাউড সার্ভিস ছোট ও প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের জন্য সহজেই ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গা থেকে ডেটা আপলোড ও ডাউনলোড করা যায়। নিজস্ব হার্ডওয়্যার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। শুধু তাই নয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট হয় বলে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, লাইসেন্স ফি ইত্যাদির জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় না। পরিচালনা ব্যয় কম এবং স্বল্প সংখ্যক ও প্রশিক্ষণবিহীন জনবল দিয়েও অনেক কাজ করা যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে পৃথিবীর প্রযুক্তির জগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে সত্যি কিন্তু একই সাথে এটি তথ্যের জগতে বিশাল নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। এই সার্ভিসে আপলোড করা তথ্য কোথায় সংরক্ষিত এবং প্রক্রিয়াকরণ হয়, তা ব্যবহারকারী জানতে পারে না। সেই তথ্য বা ডেটার উপর এবং প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের উপর ব্যবহারকারীর একক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা কম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ডেটা স্থানান্তরের হার কোনটি?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ক. ব্যান্ড মিটার | খ. ব্যান্ডউইথ |
| গ. ডেটা ট্রান্সমিশন | ঘ. ডেটা কানেকশন |

২. গ্রুপ SMS হলো-

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. ইউনিকাস্ট | খ. মাল্টিকাস্ট |
| গ. ব্রডকাস্ট | ঘ. টেলিকাস্ট |

৩. নিচের কোন ডিভাইসটিতে ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব?

- | | |
|------------|---------|
| ক. হাব | খ. সুইচ |
| গ. রিপিটার | ঘ. NIC |

৪. বিট সিনক্রোনাইজেশন হচ্ছে-

- বিট প্রেরণের সমন্বিত পদ্ধতি
 - ডেটার বিটের বিন্যাস ও সংযুক্ত অতিরিক্ত বিট
 - ব্যান্ড উইডথের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য-

- হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
 - সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার
 - একের অধিক কম্পিউটারের সংযোগ সাধন
- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

হুমায়ুন তার বাবার অফিসে গিয়ে দেখল তার বাবা নিজের টেবিলে বসে কম্পিউটার প্রিন্ট কমান্ড দিলেন এবং তার থেকে কিছু দূরে অবস্থিত অফিসারও একই সাথে প্রিন্ট কমান্ড দিয়ে একই প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট নিলেন। হুমায়ুনের বাবা নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করে বিদেশে অবস্থানরত একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বললেন।

৬. উদ্দীপকে নেটওয়ার্কের ধরন হচ্ছে-

- i. LAN
- ii. WAN
- iii. MAN

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৭. উদ্দীপকের ব্যবস্থায় সম্ভব-

- i. ক্ষুদ্র ডিভাইসে অধিক সেবা
- ii. গ্রাহকদের সাথে সহজ যোগাযোগ
- iii. ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি রুমে থাকা ল্যাপটপগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক হবে কোনটি?

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ক. WPAN | খ. WLAN | গ. WMAN | ঘ. WWAN |
|---------|---------|---------|---------|

৯. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটির ল্যাপটপগুলো সংযুক্ত-

- i. ক্যাবলের মাধ্যমে
- ii. ক্লায়েন্ট সার্ভারের মাধ্যমে
- iii. ওয়াইফাই-এর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কামাল রেজা সাহেব ঢাকায় অবস্থিত তার অফিসের বিভিন্ন শাখায় তথ্য আদান প্রদানের জন্য কয়েকটি কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলেন। এখন তিনি ডেটার গতি বৃদ্ধির জন্য কমিউনিকেশনের মাধ্যম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১০. উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক কোনটি?

- | | |
|--------|--------|
| ক. PAN | খ. LAN |
| গ. MAN | ঘ. WAN |

১১. কামাল রেজা সাহেবের সিদ্ধান্তের ফলাফল কী হবে?

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ক. বাস্তবায়ন খরচ হ্রাস পাবে | খ. ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি পাবে |
| গ. বেশি শক্তি ব্যবহৃত হবে | ঘ. প্রতিস্থাপন সহজ হবে |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'X' কলেজে মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের ৩টি আলাদা ভবন রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে তাদের কম্পিউটারের মধ্যে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রতিটি বিভাগকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিভাগগুলোর দূরত্ব বেশি হওয়ায় মাধ্যম হিসেবে ক্যাবল ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না।

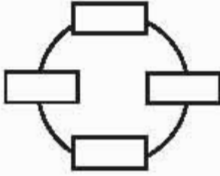
ক. ব্যাভ উইডথ কী?

খ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

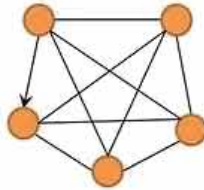
গ. 'X' কলেজটির বর্তমান নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন মাধ্যমটি নির্বাচন করা উচিত - যুক্তিসহ মতামত দাও।

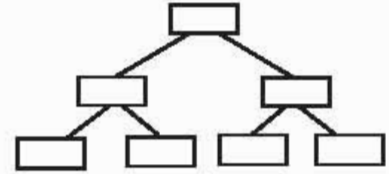
২.



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩

ক. মডুলেশন কী?

খ. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে চিত্র-১ এর প্রতিটি কম্পিউটার পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হলে যে টপোলজি তৈরি হবে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র ২ ও চিত্র ৩ নম্বর টপোলজিগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক হবে - উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩. সোহেল ইকবাল তার অফিসের দ্বিতীয় তলায় বন্ধু আরিফের সাথে বিনা খরচে তথ্য শেয়ারিং করছিলেন। এমন সময় পঞ্চম তলার তার সহকর্মী একটি ফাইলের তথ্য দেখতে চাইলে তিনি সিটে বসেই নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় সহকর্মীর কম্পিউটারে তা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে সোহেল ইকবাল ফাইলের তথ্য বিদেশে অবস্থানরত ক্রেতার কাছে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রেরণ করেন।

ক. ফুল ডুপ্লেক্স কী?

খ. ডেটা ব্লক যা প্যাকেট আকারে ট্রান্সমিশন হয়, ব্যাখ্যা কর।

গ. সোহেল ইকবালের বন্ধু আরিফের সাথে তথ্য শেয়ারিং এ ব্যবহৃত নেটওয়ার্কটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তথ্য পাঠাতে আরিফের ব্যবহৃত নেটওয়ার্কের মধ্যে দ্বিতীয়টিই উত্তম- মতামত দাও।

৪. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তলার অনেকগুলো কম্পিউটার একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলো। কিছুদিন পর বিশেষ একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় অন্য কম্পিউটারগুলো থেকে তথ্য আদান-প্রদানে জটিলতা দেখা দিল।

ক. NIC কী?

খ. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন টপোলজি ব্যবহার করেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে জটিলতা এড়াতে কোন টপোলজি ব্যবহার করা প্রয়োজন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।